ব রি শা ল জে লা

দেশকে স্বাধীন করতে হবে

আমি আমার নানু শেফালী বেগমের কাছে একদিন জানতে চাইলাম আমার নানা শহীদ কাজী মোজাম্মেল হক সম্পর্কে। তিনি কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিলেন এবং কীভাবে শহীদ হলেন। নানু আমাকে বললেন, তোমার নানা যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় খুলনা থেকে পায়ে হেঁটে আমার বাবার বাড়ি উজিরপুর থানার আটিপাড়া গ্রামে আসেন এবং তখন আমি আমার বাবার বাড়িতেই অবস্থান করছিলাম। তখন পর্যন্ত আমার মায়ের জন্ম হয়নি বলে নানু জানান। ওখানে অবস্থান করার সময় গোপনে মুক্তিযোদ্ধা তৈরির কাজ শুরু করেন নানা। নানুকে নানা কিছুই বলতেন না। আমার নানার সাথী মুক্তিযোদ্ধারা সৈয়দ মকবুল (হস্তিশুণ্ড নিবাসী) এবং তৎকালীন সেনাবাহিনীর সদস্য আলী আশ্রব জামাদ্দার (সানুহার নিবাসী) ২টি রাইফেল নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের কাজে বের হতেন। নানু তাদের নিষেধও করতেন, কিন্তু তারা বলতেন, 'দেশেকে স্বাধীন করতে হবে, মরতে হলে মরবো।' পরবর্তীকালে নানুকে নিয়ে আমার নানা তার নিজ গ্রাম বরিশাল জেলাধীন উজিরপুর উপজেলার চাঙ্গুরিয়া গ্রামে আসেন। সেখানে আসার পর এলাকার কিছু লোক তার কাছে আসেন এবং বলেন, আপনি আর্মির লোক, আপনি আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিবেন। তারপর থেকে নানা নারায়ণপুর বসে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিতেন। তখনও তিনি বাড়ি ছেড়ে যুদ্ধে যাননি। হঠাৎ একদিন পশ্চিমা হানাদার বাহিনী গানবোটে করে গুঠিয়া এসে নামে।

এরপর গণহত্যা করতে করতে চাঙ্গুরিয়া গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং মানুষের কাছে জিজ্ঞাসা করে যে, কাজী মোজাম্মেল হকের বাড়ি কোন দিকে? ইতিমধ্যে নানাজান বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়েন এবং হানাদার বাহিনীর সম্মুখে পড়ে যান। দূর থেকে অনেকেই দেখেছেন তার দিকে রাইফেল তাক করে আছে। নানু বললেন যে, আমার নানা উর্দু বলতে জানতেন এবং তার কাছেও কাজী মোজাম্মেল হকের বাড়ির কথা জানতে চান। নানা উর্দুতে বললেন যে, সামনের দিকে একটু গেলেই পাবেন। এ সময় হানাদার বাহিনী অনেককে গুলি করে হত্যা করে। হানাদাররা চলে যাবার পর আমার নানা কিছু ঔষধপত্রসহ আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য বের হন। সম্ভবত তার বাড়ির পাশের ফকির বাড়ির একজনের পেটের নাড়িভুড়ি বের হয়ে গিয়েছিলো। নানা তার নাড়িভুড়ি পেটের মধ্যে ঠেলে দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে লোকাটি মারা যান। এরকম অসংখ্য লোক সেদিন গণহত্যার শিকার হয়েছেন।

এরপর নানু বলেন যে, এ সময় আমার মায়ের বয়স এক মাসের মতো হয়েছে। সেই গণহত্যার রাতে নানা নানুকে বললেন, 'আজই আমার মৃত্যু হতো, আমাকে মারার জন্যই তো ওরা এসেছিলো, কারণ আমি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দেই। আল্লাহই আমাকে বাঁচিয়েছেন। কালই আমি যুদ্ধে যাবো। নানু অনেক অনুনয়-বিনয় করে নানাকে তার দেড় বছরের ছেলে ও এক মাসের মেয়ে রেখে যেতে নিষেধ করলেন। বললেন, 'আমি একা কি করে থাকবো?' আমার

নানার মা তখনও জীবিত ছিলো। নানা তার মাকে বললেন 'তুমি এই পাগলীকে বোঝাও ও যেনো আমাকে যুদ্ধে যেতে বাধা না দেয়, তুমি ওকে ফেরাও। ওদের দেখে রেখ।' তারপর নানা যুদ্ধে চলে যান এবং বানারীপাড়ার আলতা গ্রামের চৌধুরীবাড়ির ক্যাম্পের দায়িত্বে নিয়োজিত হন।

কিছুদিন পর স্বরূপকাঠির বানারীপাড়ায় গানবোটে করে আক্রমণ চালায় পশ্চিমা হানাদার বাহিনী। তখন তাদের সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধেই নানা শহীদ হন। কেউ কিছু জানে না। হঠাৎ একদিন মুক্তিযোদ্ধারা একটি লাশ নিয়ে বাড়ি গেলো। তখন ছিলো ভাদ্র মাস, চারদিকে পানি থৈ থৈ। মাটি উঁচু করে তাকে দাফন করে গেলো। আমার নানার সহযোদ্ধারা ছিলো ক্যাপ্টেন ওমর (বীর উত্তম), এম.এ.হক (বীর বিক্রম), বাড়ি আগরপুর, মালেক মিলিটারি, বাড়ি কাজীরচর এবং আরও স্থানীয় কয়েকজন। তারপর আমার নানু তার বাবার আশ্রয়ে উজিরপুর থানার আটিপাড়া গ্রামে চলে যান এবং তার দেড় বছরের ছেলে ও এক মাসের মেয়ে, আমার মাকে নিয়ে দিন অতিবাহিত করে আর একটি জীবন-যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তিনি তার ছেলেমেয়েদের যথাযথভাবে সুশিক্ষিত করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বর্তমানে তার ছেলে বি.এন. খান ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক এবং মেয়ে অর্থাৎ আমার মাও পাস করেছেন এবং তার জামাতা অর্থাৎ আমার বাবাও কলেজের একজন সহকারী অধ্যাপক। আর এ সকল কিছুই আমার নানুর কষ্টের ফসল। নানুর কাছে এখনো নানার রক্তমাখা জামাটি সংরক্ষিত আছে। নানু বলেন, 'আমি শহীদের স্ত্রী হিসেবে নিজেকে ধন্য মনে করছি।' আমিও একজন শহীদের নাতি হিসেবে গৌরবান্বিত বোধ করছি।

উপজেলার সামনে স্মৃতিফলকে আমার নানার নাম আছে। স্মৃতিফলকটির পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় নানার কথা খুব মনে পড়ে, যদিও তাকে দেখিনি। কিন্তু তিনি তো দেশমাতৃকার জন্যেই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, এ কথা ভেবে গর্বে বুকটা ফুলে ওঠে।

সূত্রঃ জ- ১৪৮৫৪

সংগ্রহকারী:	বর্ণনাকারী:
সৈয়দ মাইদুল ইসলাম	**শেফালী বেগম**
ডবিউ.বি.ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশন	স্বামী: শহীদ মোজাম্মেল হক
১০ম শ্রেণি, বিজ্ঞান শাখা, রোল:	গ্রাম+পোস্ট: আটিপাড়া, থানা: উজিরপুর, জে: বরিশাল

রক্তে রঞ্জিত অবস্থায় চিৎকার করছে

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিকবাহিনী ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ সদর দপ্তরে আক্রমণ করে। তখন আমি চন্দ্রঘোনা পেপার মিলে ওয়ার্কার্স ক্লাবে কর্মরত ছিলাম। পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী চট্টগ্রাম হতে কাপ্তাই এবং চন্দ্রঘোনা আসার পথে কালুরঘাটে বাংলাদেশের আর্মি, পুলিশ, ইপিআর এবং আনসার বাহিনী তাদের প্রতিরোধ

করে। প্রায় ৩/৪ দিন কালুরঘাটে যুদ্ধ চলার পর চন্দ্রঘোনা পেপার মিল এলাকায় পাকবাহিনী পৌঁছে যায়। আমি এবং আমার এক ভাই সপরিবারে কর্ণফুলী নদী পার হয়ে নারাংগিরীর পশ্চিমে এক গ্রামে আত্মগোপন করি। দিনে জঙ্গলে ও রাতে এক বাড়িতে আশ্রয় নেই। এভাবে ১০/১৫ দিন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাটানোর পর গ্রামের পথ ধরে চট্টগ্রামের দিকে অগ্রসর হই। প্রায় এক সপ্তাহ এভাবে কাটানোর পর মে মাসের ১৬ তারিখে অতিকষ্টে চট্টগ্রাম পৌঁছি। তখন লোক মারফত জানতে পারি যে, চট্টগ্রাম থেকে সমুদ্রপথে জাহাজ বরিশাল আসা-যাওয়া করে। এর পূর্বে এক হৃদয়-বিদারক ঘটনা প্রত্যক্ষ করি। একদিন চন্দ্রঘোনা বাসায় অবস্থানকালে দরজায় দাঁড়িয়েছিলাম। বাসাটি ছিল পেপার মিল এলাকার রাস্তার কাছে। হঠাৎ একটি ট্রাক মিল এলাকায় প্রবেশ করে। ট্রাকের ভিতর থেকে ঝর্না বেগে রক্ত রাস্তায় পড়ছে। তখন রাস্তার পাশে দাঁড়ানো লোকের কাছে কারণ জানতে চাইলে তারা বলে যে, কতগুলি লোক হত্যা করে মিলে মাটি চাপা দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যাই হোক চট্টগ্রাম সদরঘাট এসে দেখলাম যে, ঠিকই জাহাজ বরিশালের উদ্দেশে চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে যাবে। আমরা সেই জাহাজে উঠে ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় বসে রইলাম। চট্টগ্রাম আসার পথে কর্ণফুলী নদীর প্রায় সমস্ত এলাকায় মানুষের মরা দেহ ভাসতে দেখলাম। আমাদের পরনে ছিল ছেড়া-ফাঁড়া কাপড় এবং সাথে পুরাতন বালিশ। মোট কথা সম্বলহীন মানুষের মত। মাঝে-মধ্যে পাক হানাদাররা দাঁড় করিয়ে নাম এবং পরিচয় জানতে চাইল। যখন আমি নামের পরে খান ব্যবহার করতাম তখনই বলত হট যাও। ১৯৭১ সালের ২৩ মে আমরা জাহাজযোগে বরিশাল এসে পৌঁছলাম। এখানে এসেও এক করুণ দৃশ্য নজরে পড়ল। দুটি যুবক ছেলেকে পাকবাহিনীর গাড়ির সাথে রশি দিয়ে বেঁধে রেখেছে। জানা গেল ঐ ছেলে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তাদের নিকট নথিপত্র ছিল। তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হয়েছিল কিনা জানি না। এদিকে জাহাজে উঠে আর এক করুণ দৃশ্য চোখে পড়ল। আমরা যেদিন এসেছি তার পূর্বের যাত্রাপথে গর্ভবতী এক মহিলার উপর পাশবিক অত্যাচার করা হয় এবং উক্ত মহিলার সারা শরীর রক্তে রঞ্জিত অবস্থায় চিৎকার করছে।

বাড়িতে অবস্থান কালের ঘটনা অনেক মনে পড়ে কিন্তু তারিখগুলি মনে নাই। একদিনের ঘটনা, বরিশালের কলাতামা গ্রামের আমার এক ফুফাতো ভাই কলেজের ছাত্র। একদিন রাত্রে মুক্তিবাহিনীর জোয়ানরা কাশিপুর এলাকায় একটি পুল ধ্বংস করে ফেলায় ওই ছেলেটি সকালবেলা দেখছিল কিভাবে পুলটি উড়িয়ে দিয়েছে। ইতিমধ্যে একটি জিপ গাড়িতে একদল পাকসেনা সেখানে এসে উপস্থিত। তখন ছেলেটিকে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখে কিছুদূর চলে যাওয়ার পর পুনরায় সেখানে এসে ছেলেটিকে পিটিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।

সূত্রঃ জ ১৪৪৯৪

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. রনী হোসেন	**মো. আবদুল মালেক খান**
মাধবপাশা চন্দ্রদ্বীপ হাই স্কুল ও কলেজ	গ্রাম: লাফাদি(পশ্চিম), পোস্ট:
৯ম শ্রেণি, ব্যবসায় শিক্ষা শাখা, রোল: ২৯	মাধবপাশা
	উপজেলা: বাবুগঞ্জ, জেলা: বরিশাল

'হয় হয়' করতে লাগলো

আমার নাম মিনু বেগম। আমার বাল্যকালে বিয়ে হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমার তিন ছেলে ও এক মেয়ে ছিলো। আমাদের বাড়ি থেকে প্রায় ১ কি. মি. দূরে বাজার। মাঝে মাঝে শুনতাম পাকিস্তানি মিলিটারি বাজারে আসে, লোকজন ধরে নিয়ে যায়। হঠাৎ একদিন শুনলাম তারা গ্রামের ভিতরে এসেছে। আমি ভয়ে ছেলেমেয়েদের বুকে চেপে ধরলাম। তখন রাত আটটা বাজে। ঘরে খাওয়ার মতো কিছুই ছিলো না। আমি ও আমার স্বামী সন্তানসহ ঘরের মেঝেতে ছোট কুপি ধরে বসেছিলাম। হঠাৎ একটা বড় শব্দ হলো। আমাদের বাড়ির পাশের ঘরবাড়ি সব পুড়িয়ে ফেললো পাকিস্তানি মিলিটারিরা। ভিতর থেকে আমার এক প্রতিবেশী আবুল হোসেনকে বাইরে টেনে নিয়ে আসে। তার এক ছেলে পাশে দাঁড়িয়ে 'বাবা' বলে চিৎকার করলো। আমি তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে কুপি নিভিয়ে দিলাম এবং ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখতে লাগলাম। তারা আবুল হোসেনের বুকে প্রথমে লাথি মারলো। পরে তাদের ভাষায় কি যেনো বলতে লাগলো, কিন্তু আবুল হোসেন কিছুই বুঝতে পারলো না। শুধুমাত্র "হয় হয়" করতে লাগলো। পাকিস্তানি মিলিটারিরা তাকে গাছের সাথে বেঁধে বুক বরাবর দুটি গুলি করলো। আমি তাই দেখে চিৎকার করে উঠলাম। তারা আমাদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে দৌড় দিলো, আমি ও আমার স্বামী পিছনের দরজা দিয়ে দৌড় দিলাম। আমাদের বাড়ির পাশে একটি বেতবাগান ছিলো। দৌড়ে আমরা সেখানে গেলাম। আমার ছোট বাচ্চাটা কোলে ঘুমন্ত ছিলো। সে হঠাৎ জেগে উঠে কাঁদতে লাগলো। তাই আমার আরও ভয় করতে লাগলো। পাকিস্তানি মিলিটারিরা আমাদের বাড়িতে খুঁজে না পেয়ে যখন বেত বাগানের কাছাকাছি আসলো তখন আমরা ভেবেছিলাম আজ সত্যিই মারা যাবো। হঠাৎ তাদের পিছন থেকে কিছু লোক দৌড়ে পালালো। মিলিটারিরা তাদের লক্ষ্য করে ধাওয়া করলো, বাগানে গুলি করলো। লোক মারা গিয়েছিলো কি না তা জানি না, কারা ছিলো তাও জানি না। আমরা তখন ওখান থেকে দৌড়ে আমাদের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে পুরানো একটা দালানে গেলাম। সারারাত সেখানে বসে কাটিয়েছি। সকালে শুনলাম তারা আবার শহরে ফিরে গেছে। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে কষ্টের ঘটনা, যা কোনো দিনও ভুলতে পারবো না।

সূত্র: জ- ১৫৫৬২

সংগ্রহকারী:	বর্ণনাকারী:
তাজমিন আক্তার	**মিনু বেগম**
বাটাজোর অশ্বিনী কুমার মাধ্যমিক বিদ্যালয়	গ্রা+পো: শিকারপুর
৮ম শ্রেণি, শাখা: খ, রোল:২৪	থা: উজিরপুর, জে: বরিশাল
	বয়স: ৬৫, সম্পর্ক: নানি

আমি গাড়িতে জুতা মারলাম

আমি হাজী ওহাব হাওলাদার। আমার যতটুকু মনে পড়ে তা হলো আমি যখন ক্লাস সেভেনে পড়ি তখন আমি পড়ালেখা বাদ দিয়ে স: প্রা: বিদ্যালয়ে ছয় মাসের ট্রেনিং নেই। তার দুই মাস

পর তখন ১৯৩৫ সালে আমার চাকরি হয়। তখন আমার বেতন ৭ টাকা ৩ পয়সা। ১৯৪০ সালে বেতন হয় ১০ টাকা। তখন ঐ এলাকার মধ্যে আমি ছিলাম খুব শিক্ষিত। তারপর শুনলাম ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে আমাদের দেশের ঝামেলা হয়েছে। তারপর হঠাৎ শুনলাম ২৫ মার্চ রাতে ঢাকার বস্তি এলাকায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গোলাগুলি শুরু করে। ১৫ দিন পর আমাদের এলাকায় শুরু হলো গোলাগুলি। উত্তর বাটাজোরে বসলো পাকিস্তানি হানাদারদের ক্যাম্প। এর মধ্যে আমাদের শৌলকরে অনেক মানুষ খুন হলো। তখন আমি শিক্ষক নামে পরিচিত। আমি লক্ষ্মণকাঠী বিদ্যালয়ে যাচ্ছিলাম। এর মধ্যে পাকিস্তানি তিনটি গাড়ি এসে আমাকে ঘিরে ফেললো। তারা সবাই নেমে আমার পিঠে বন্দুক ঠেকালো। একজন আমাকে বললো, ওদারমে যাও। আমি পেছনে এগুতে থাকি। আমার শার্টের বুক পকেট অনেক কাগজে ভর্তি ছিলো। তাদের অফিসার আমাকে আবার ডাক দেয়। আমি দৌড়ে তার কাছে এসে তার পা ধরি। সে আমার বুক পকেটে হাত দেয়। ভাগ্যিস আমার কাছে একটি শিক্ষকের কাগজ ছিলো। সে বললো, তু শিক্ষক হায়। আমি হ্যাঁ বললাম, পরে বললো যাও। আমি তখন বুঝলাম আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। আমি চলে গেলাম। আমি বিদ্যালয় থেকে এসে শুনি আমাদের গ্রামে অনেক ঘরে আগুন জ্বালিয়েছে, লুটপাট হয়ে গেছে। এর সাথে হয়ে গেছে কেউ পুত্রহারা, কেউ মাতৃহারা এবং প্রায় শিশু এতিম। যুবতী নারীরা হয়েছে সম্মানহারা। ১৭ জুলাই আমার বাড়ির এক ফুফু শালুক টোকাতে গিয়ে দেখতে পায় লাশসহ দুটি অস্ত্র। সে এই কথা গোপনে আমার কাছে এসে বলে। মহিলাদের মুখ মুখে এ কথা প্রায় মানুষের কাছে পৌঁছায়। এর সাথে পৌছে যায় পাকিস্তানি ও মুক্তিযোদ্ধাদের কানে। ১ আগস্ট হঠাৎ আমার বাড়িতে পাকিস্তানি বাহিনী চলে আসে। তাদের কমাণ্ডারের কথা কিছু বুঝলাম না কিন্তু রাজাকার মানিক বলে, তুই যে অস্ত্র পাইছো তা এই গৌরনদী উপজেলার সবচেয়ে শক্তিশালী বন্দুক। তা আমাদের কাছে জমা দাও। আমি সাথে সাথে তা দিয়ে দিলাম। ১৮ আগস্ট মুক্তিযোদ্ধা চলে আসে আমার বাড়িতে। তারাও সেই একই কথা বলে। তখন আমি দাঁড়িয়ে রইলাম কারণ আমাদের কাছে কোনো অস্ত্র ছিলো না। আমার সেজো ও মেজো ছেলে কোথা থেকে যেনো এসে কানে কানে বলে, উত্তর পাশের পাটকাঠির মাচায় লুকিয়ে রেখেছি অন্যটা। তাদের আমি সেই অস্ত্র দেখিয়ে জানে বেঁচে গেলাম।

১ ডিসেম্বর আমাদের উত্তর বাটাজোর পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প দখল করলো মুক্তিযোদ্ধারা। তখন আমার পূর্ব পাশে কূপের মধ্যে লুকালো পাকিস্তানি হানাদার ও রাজাকাররা। আমি খবর দিলাম মুক্তিবাহিনীকে। তারা এসে সোজা ব্রাশ ফায়ার দিয়ে মেরে ফেললো। আমার চোখের সামনে জবাই হলো ৭ জন রাজাকার। এর পর এলো ১৬ ডিসেম্বর, আমাদের স্বাধীনতা দিবস। আমরা খুশিতে লাফালাফি করলাম। রাস্তায় গিয়ে দেখলাম পাকিস্তানি হানাদাররা একে একে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। আমি গাড়িতে জুতা মারলাম।

কিন্তু স্মরণ, তোদের এই কথা বলে আমার জীবন পবিত্র মনে হচ্ছে। এখনও তো আমি ওহাব মাস্টার নামে পরিচিত। যুদ্ধের কয়েকমাস পরে আমি হজ্বে চলে গেলাম। দেশে ফিরে আমার দেশকে সুন্দর ও শান্তিময় মনে হলো।

সূত্র: জ- ১৫৫৯৩

সংগ্রহকারী:
আল মাহমুদ স্মরণ
বাটাজোর অশ্বিনী কুমার মাধ্যমিক বিদ্যালয়
৭ম শ্রেণি, রোল: ২১

বর্ণনাকারী:
ওহাব মাস্টার
গ্রাম: বাটাজোর, থানা: গৌরনদী
জেলা: বরিশাল
বয়স: ৯৪, সম্পর্ক: দাদা

মৃত্যু দিলে যুদ্ধক্ষেত্রে দিও

আমার আপন ফুপা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এএমজি কবির। পঞ্চাশোর্ধ এই সুহৃদ মানুষটির দুর্দমনীয় সাহস, অপরিসীম ধৈর্যশক্তি এবং দেশের প্রতি এক অনির্বচনীয় ভালোবাসা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে তার আত্মকথা তুলে ধরায়।

আমি এএমজি কবির, বরিশালে সবার কাছে 'ভুলু' নামে পরিচিত। যুদ্ধের পূর্ব থেকেই সংগ্রামের বিভিন্ন আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন আমি বিএম কলেজের দায়িত্বে ছিলাম। ২৬ মার্চ সকালে বিএম কলেজের ট্রেনিং রুমের ভেন্টিলেটর ভেঙে বের করে আনি ডিপিএলএমজি। আমি কাশিপুর আমার দলের সাথে মিলিত হয়ে ৩৫ জন ছেলে সংগ্রহ করে দ্রুততার সাথে দলগঠন করি। প্রথম অপারেশনে বানরিপাড়া থানার পুলিশ স্টেশন থেকে ১৯টি রাইফেল সংগ্রহ করি। এরপর শুরু হয় পুরোদমে লড়াই। মঠবাড়িয়া, তুশখালি, ভান্ডারিয়া ও রাজাপুর থানার মুক্তিক্যাম্পে মিটিং আর ছোটখাট অপারেশনের পর আটঘর কুরিয়ানায় নরেকাঠি রায়ের বাড়িতে সম্মুখযুদ্ধ করি। এরপর সংগঠিত হয় ঝালকাঠি থানার পার্শ্ববর্তী ঝাউকাঠি গ্রামে আর্মিদের বিপক্ষে সশস্ত্র যুদ্ধ। এই অপারেশনে আমার এবং মাহফুজ আলম বেগ ও খোকা চৌধুরীর নেতৃত্বে ছিল ৩৫ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা। পুরো একদিন চলে গুলি ও পাল্টা গুলি। পরদিন আর্মিরা আমাদের ঘিরে ফেলে। তাই অস্ত্র মাটির নিচে পুঁতে রেখে বাধ্য হয়ে পিছু হটে আসি। চলে আসি গৌরনদীর বারোহাজার গ্রামের দেশের বাড়িতে। কিন্তু এ বাড়ি ফিরে আসাই আমার কাল হয়। গ্রামে ফিরে দেখি আমাদের পার্শ্ববর্তী সেরাল গ্রামে আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাড়িতে খানসেনারা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তাই আমি আমার গ্রামের লোকদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে সেখান থেকে চলে আসার সংকল্প করি।

পরদিন সকালে মাঝির বেশে নদীপথে শায়েস্তাবাদের কমিশনার চরে যাত্রা করি। আমার উদ্দেশ্য ছিল পুনরায় মুক্তিবাহিনীকে একত্রিত করে বরিশালে অপারেশন করা। আমার সঙ্গী ছিল নৌকার মাঝি ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের সিপাহি আনোয়ার হোসেন। পরদিন ১৬ জুলাই নৌকা সার্চ করতে আসে পুলিশ। দুর্ভাগ্যক্রমে তারা লুকানো অস্ত্র দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ আমাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে। আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয় গৌরনদী কলেজে। সেটা ছিল তৎকালীন পাকসেনাদের নির্যাতন কেন্দ্র ও একটি প্রধান ঘাঁটি। এখানে দুইশ থেকে আড়াইশ আর্মি ও প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র মজুত ছিল।

শুরু হয় আর্মির পিশাচদের মধ্যযুগীয় অত্যাচার। তারা আমাকে ও আনোয়ারকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত পেটাতে থাকে। ধারালো বেয়নেট দিয়ে পা কেচে দেয় আর চিৎকার করতে থাকে, শালা বানচোত বাতাও। বাতও মেজর জলিল কাহা, মঞ্জু উকিল কাহা, বাতাও তো তুমকো ছোড় দেগা।

দীর্ঘক্ষণ চললো এই নির্যাতন। আমি কেবল মনে মনে প্রার্থনা করতে থাকি, খোদা তুমি আমাকে সহ্যশক্তি দাও। আমার জবান থেকে যেন একটি নামও উচ্চারিত না হয়। সময় যতই গড়াতে থাকে ততই বাড়তে থাকে তাদের অত্যাচারের মাত্রা। নির্মম আক্রোশে তারা আমার পিঠ বেয়নেট দিয়ে কেচে দেয়। আমি বিড়বিড় করে বলতে থাকি। হা ম্যায় কমান্ডার হু। মেরে পাস স্টেনগান, গ্রেনেড থা, ম্যায় আউর কুছ নেহি জানতা।

এবার আর্মিরা আমাকে চিরতরে পঙ্গু করে দেয়ার সংকল্প করল। তারা জোড়াথাপড়ে আমার বা কানের শ্রুতিশক্তি চিরতরে নষ্ট করে দেয়। আমি যন্ত্রণায় চোখে অন্ধকার দেখতে শুরু করি। আমার চিন্তাশক্তি লোপ পেতে থাকে। এরপর সকাল নয়টা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত তারা আমাকে উল্টো করে ফ্যানের সাথে ঝুলিয়ে পেটাতে থাকে। আঘাতে আমার দাঁত ভেঙে যায়। এখানেই শেষ নয় নরপিশাচদের পৈশাচিক নির্যাতন। মুখ খোলাতে না পেরে তারা আর্মিভ্যানে আমাদের নিয়ে আসে ওয়াপদা ক্যান্টনমেন্টে। এখানে এনে সকাল নয়টা থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত আবারও চালায় নিষ্ঠুর অত্যাচার। যাকে ভাষায় প্রকাশ করা হয়তো কোন দিন সম্ভব হবে না। এরই মাঝে অত্যাচার সইতে না পেরে মারা যায় আনোয়ার। এক অদ্ভুত কষ্টে আমার গলা আটকে আসে। ভাবি, আমি তো মরবোই, খোদা তবে কেন আমাকে ওর সঙ্গে নিলে না? তবু এত অত্যাচার সয়ে মৃত্যুবরণ করার পরও আনোয়ারের কপালে জোটেনি চিরনিদ্রায় যাওয়ার জন্য একটু মাটি। আর্মিরা তার লাশ ফেলে দেয় সাগরদাড়ির খালে।

এখান থেকে যশোর ক্যান্টনমেন্ট হয়ে যশোর জেলে নেয়া হয় আমাকে, পথিমধ্যে বাংলার যোদ্ধাদের চরম প্রতিক্রিয়া দেখে আমি বুঝতে পারি, এই সংগ্রামে দেশ স্বাধীন হবেই।

যশোর জেলে দেখা দেয় আমার তীব্র শারীরিক প্রতিক্রিয়া। আমি চোখে ঝাপসা দেখতে শুরু করি, কানে পুঁজ জমে যায়, কারো সাহায্য ছাড়া হাঁটতে অপারগ হয়ে পড়ি। তবু খোদার প্রতি বিশ্বাস অটুট রেখে ফরিয়াদ জানাই, হে খোদা, আমাকে মৃত্যু দিলে যুদ্ধক্ষেত্রে দিও। আর মাতা পিতাকে দাও সহ্যশক্তি।

এরপর ১৯৭১, ২১ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাধারণ ক্ষমায় আমি জেল থেকে মুক্তি পাই। ফিরে আসি বরিশালের শীতলা খোলাস্থ নিজ বাসভূমিতে। শহরে চার দিন অবস্থানকালে আমার সহযোদ্ধা নজরুল ইসলামকে রাজাকাররা মেরে ফেলে। নিজের হত্যা পরিকল্পনার সংবাদ পেয়ে সেই রাত কাটাই পার্শ্ববর্তী তশিলদারের বাড়িতে বড় বোন হাফিজা খানমের সাথে শাড়ি পরে।

পরদিন ভোরে খেয়া পার হয়ে চলে যাই পূর্বের ঘাঁটি কমিশনার চর। এখানে সাক্ষাৎ করি সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আবদুর রহমানের সাথে। তিনি আমাকে ভারত থেকে ট্রেনিং নিয়ে আগত একটি ৫০ জনের দলের ইনচার্জ করে মেহেন্দিগঞ্জ পাঠিয়ে দেন।

এখানে কুদ্দুস মোল্লা ও আমার গ্রুপের যৌথ অপারেশন পরিচালিত হয়। বরিশাল ৮ ডিসেম্বর স্বাধীন হলেও স্থানীয় পুলিশ রাজাকাররা আনুমানিক ১৩ ডিসেম্বর আত্মসমর্পন করে। আমি

তাদের প্রথম বরিশালের ওয়াপদা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাই। পরে সেখান থেকে তাদের জেলে প্রেরণ করি।

দেশ স্বাধীন হলে ১৬ ডিসেম্বরের পরে আমি আমার সহযোদ্ধা মাহফুজ আলম বেগ ও খোকা চৌধুরীসহ ঢাকায় গিয়ে মেজর খালেদ মোশারফের কাছে অস্ত্র সমর্পণ করে বরিশালে ফিরে আসি।

আমার ফুপা বীর মুক্তিযোদ্ধা যেন আজও জাতির অতন্দ্র প্রহরী। তিনি মনে করেন, সশস্ত্র সংগ্রাম শেষ হয়েছে বটে; কিন্ত এখনও দেশ দারিদ্র, দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা, সামাজিক অবক্ষয় এবং ইতিহাস বিকৃতি থেকে মুক্তি পায়নি। এখনও লড়ে যেতে হবে এই সকল অপতৎপরতার বিরুদ্ধে। ব্যক্তিজীবনে তার মা তাকে যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর বলেছিলেন, দেশ স্বাধীন করেছিস ভালো কিন্তু আর যেন তোর এই হাত কারও বিরুদ্ধে না ওঠে। তিনি তার কথা রেখেছেন। নিজের জীবনের বিনিময়েও তিনি তার এই আদর্শকে ধরে রেখেছেন।

তার মতো এমন অসংখ্য বীর যোদ্ধা দেশের আনাচে-কানাচে থেকে আজও লড়ে যাচ্ছেন জীবনের সাথে। তারা আমাদের প্রজন্মকে দিয়েছেন এক টুকরো স্বাধীন ভূমি, আরও একটু ভালোভাবে বাঁচার অধিকার আর মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর অনিঃশেষ গৌরব। তাই তাদের কাছে আমরা চিরঋণী। দেশের উত্তর-প্রজন্ম হিসেবে তাদের প্রাপ্য সম্মানটুকু দেয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আর তাদের মহান আদর্শ ও চেতনাকে বুকে ধারণ করে আমরা এগিয়ে যাবো তাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার লক্ষে। সেটি হবে তাদের জন্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিদান।

সূত্র : জ ১৪১২৭

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মাহেরা বিনতে রফিক	**এএমজি কবির**
বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	বয়স: ৫৯ বছর
শ্রেণি-৯ম রোল নং- ০১	সম্পর্ক: ছোট ফুপা

একটি ভূতুড়ে গ্রামে পৌঁছি

আমার নাম যতীন কর্মকার। আমি নতুন বাজার, বরিশালে থাকি। আমি মুক্তিযুদ্ধের সময় যুদ্ধ করেছি। আমার ভাইয়ের মেয়ে লতা কর্মকার বরিশাল সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্রী। আমি তার অনুপ্রেরণায় মুক্তিযুদ্ধকালে আমার অভিজ্ঞতার কথা লিখছি। ১৯৭১ সালে আমি বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র ছিলাম।

১৯৭১ সালে যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন আমার নিজ বাসস্থান নতুন বাজারে অবস্থানরত ছিলাম। আমরা চার ভাই। আমি ছিলাম মেজ। আমার বড় ভাইয়ের খবর তখন আমরা পাইনি। আমি আমার ছোট দুভাইকে নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে দেয়াল পেরিয়ে প্রাণ বাঁচানোর উদ্দেশ্যে তিনদিন ধরে হাঁটাতে হাঁটতে আটগড় কুরিয়ানা গ্রামে গিয়ে পৌঁছাই। তখন ক্ষুধার জ্বালায়

ভাইদের নিয়ে শুধু জল খাই। রাতে অনাহারে নিদ্রা যাপনের জন্য নিরাপদ কোন জায়গা ছিল না।

বরিশালে যুদ্ধ চলাকালে আমার বাবাকে স্থানীয় দালাল ও রাজাকারের দল ষড়যন্ত্রমূলকভাবে নিরাপদ আশ্রয় ও প্রাণ বাঁচানোর কথা বলে ডেকে নিয়ে মেরে ফেলে। তার লাশ পর্যন্ত আমরা পাইনি। আমার বাবা ছিলেন স্বর্ণ ব্যবসায়ী।

আমার ভাইদের এক দয়ালু বৃদ্ধের সাহায্যে ভারতে রেখে আসি। আমি একা আবার বরিশালে ফিরে আসি। এখানে এসে আমি কয়েকদিন নকল গোঁফ, দাড়ি ও টুপি পরে মুসলমান সেজে থাকি। বরিশাল থেকে আটগড় কুরিয়ানার নবম সেক্টরে মুক্তিবাহিনীতে অংশগ্রহণ করি। দেশকে পাক হানাদার বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য মুক্তিবাহিনীতে প্রশিক্ষণ নিই। এরপর যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। পাকবাহিনী যুদ্ধ চলাকালে আমাকে ধরে নিয়ে যায় এবং বেধড়ক মারধর করে। আমার চোখে-মুখে লঙ্কার গুড়ো ছিটিয়ে দেয়। আমি কিছুদূর ঝাপসা চোখে দৌড়ে গিয়ে ডোবা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কচুরিপানায় ভর্তি পুকুরে চোখ-মুখ পরিষ্কার করছিলাম। তারপরেও আমাকে ছাড়েনি। তাদের পায়ের বুটের আঘাতে আমার শরীর রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। রক্তাক্ত অবস্থায় আমি ভাগ্যক্রমে পুকুরে কচুরি পানার ভেতরে লুকিয়ে পড়ি। পাক হানাদাররা ছিল সাত আটজন আর আমি ছিলাম একা। পাকিস্তানিরা সেই কচুরিপানার ভেতর আমাকে মারার উদ্দেশ্যে অজস্র গুলি ছোড়ে। প্রায় ১০ মিনিট পরে আমি গুলির শব্দ না পেয়ে উঁকি মেরে দেখি যে, হানাদাররা চলে গেছে। পুকুরেই আমার সারা রাত কাটে। ক্ষুধার্ত অবস্থায় ভেজা কাপড়ে হাঁটতে হাঁটতে কিছু খাবারের উদ্দেশ্যে গ্রামের একটি ছোট্ট হাটে পৌঁছি। তখন আমার পকেটে ছিল মাত্র ২৫ পয়সার একটি মুদ্রা। ৫ পয়সার এক কাপ চা ও দুই পয়সার একটি রুটি কিনে অর্ধেক খেয়েছি। এমতাবস্থায় আবার দূর থেকে গুলির শব্দ শুনতে পাই। আমি দিশেহারা হয়ে পড়ি। দৌড়াতে দৌড়াতে জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ি। পায়ে কাঁটাবিদ্ধ হয়ে আঘাতের শরীরে আবার আঘাত পাই। জ্বরে তিনদিন আমি জঙ্গলের ভেতর একা অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম। তখনকার দিন তারিখ কিছুই আমার মনে নেই। জ্বরের কবল থেকে একটু মুক্ত হয়ে আবারও ক্ষিধের জ্বালা মেটানোর জন্য হাঁটতে শুরু করি। পথঘাট কিছুই চিনি না। হাঁটতে হাঁটতে দুপুর গড়িয়ে এল। তখন দূর থেকে দেখি মানুষের বসতবাড়ি। বসত ভিটার দিকে লক্ষ করে হাঁটতে হাঁটতে তাদের কাছে গিয়ে ভিখারীর মতো কিছু খাবার চেয়ে খাই। আমার পকেটে কিছু ভেজা টাকা ছিল তার কথাও আমার মনে নেই। আধপেটা খেয়ে সে অবস্থায় আমি খুলনার দিকে রওয়ানা হই। পথে হঠাৎ কয়েকজন বন্ধুর সাথে দেখা হয়।

আমরা খুলনা-সাতক্ষীরা সীমান্ত এলাকায় যুদ্ধরত ছিলাম। যুদ্ধে থাকাকালে আমাকে মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছিল বেশ কয়েকবার। হানাদাররা আমাদের দলের বিশ পঁচিশ জনকে লাইনে দাঁড় করে এক এক করে ১৮ জনকে গুলিবিদ্ধ করে। আমি পরবর্তী দুএক নম্বরের মধ্যে দাঁড়ানো ছিলাম। বাঁচার তাগিদে লাইন থেকে আঁকাবাঁকা দৌড়াতে দৌড়াতে সাতক্ষীরা থেকে ইণ্ডিয়া যাওয়ার পথে দেখি এক প্রসূতি মা তার সদ্যজাত শিশুকে এক টুকরো কাপড়ের অভাবে কোলে নিতে পারছেন না। আমি তা দেখে আমার লুঙ্গির অর্ধেক ছিড়ে ওই প্রসূতি মাকে দিয়েছিলাম। এরপর আমি সাতক্ষীরার একটি ভূতুড়ে গ্রামে পৌঁছি। গ্রামের লোক আমার পরনে অর্ধেক ছেড়া লুঙ্গি, ভেজা জামা ও এলোমেলো চুল দেখে ভয় পায়। কিন্তু আমি তাদের বলি যে আমি মুক্তিযোদ্ধা। তাই শুনে ও আমার মতো শক্ত-সমর্থ তরুণ যুবককে পেয়ে তারা মনের অন্তরালে

বাঁচার কিছুটা জোর পেল। পরের দিন আমরা সবাই মিলে ভারতের কোন এক আশ্রয় কেন্দ্রে গিয়ে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। ওখানে গিয়ে আমি আমার ছোট ভাইদের খোঁজ পাই। ক্যাম্পে বসে ১৬ ডিসেম্বর ভোরবেলা রেডিওর মাধ্যমে বাংলাদেশের বিজয়ের কথা এবং আততায়ীদের আত্মসমর্পনের খবর শুনতে পাই। ১৭ ডিসেম্বর আমরা বাংলাদেশের নিজ বাসস্থানে এসে পড়ি।

আজ স্বাধীনতার অনেক বছর পরেও আমি আমার ভাইজির মাধ্যমে আপনাদের কাছে কিছুটা প্রকাশ করে খুব আত্মঃতুষ্টি অনুভব করছি। স্বাধীনতার এতো কথা যা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখেও মনের সাধ মেটানো যাবে না। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের এ রকম উদ্যোগকে আমি আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে সংগ্রামী শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সূত্র : জ ১৪১২৯

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
লতা কর্মকার	**বীর মুক্তিযোদ্ধা যতীন কর্মকার (৭৮৯)**
বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	বয়স: ৫৬ বছর
শ্রেণি-৯ম, রোল নং-	সম্পর্ক: চাচা-ভাইজি

আমার ছেলেকে উৎসর্গ করলাম

আমার শ্রদ্ধেয় চাচা মো: রতন আলী শরীফ একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা। তিনি বীর প্রতীক উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। তার থেকে সংগৃহীত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ঘটনাবলি উল্লেখ করা হল-

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ভাষণে বলেন যে, যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। তার এই ঐতিহাসিক ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে মো: রতন আলী শরীফ ১৮ মার্চ করাচি থেকে ঢাকায় পৌঁছেন। ১৯ মার্চ দেশের বাড়ি বাবুগঞ্জ থানার রাকুদিয়া গ্রামে পৌঁছেন। তারপর তিনি মেজর এম এ জলিলের নেতৃত্বে রহমতপুর এয়ারপোর্টে মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করেন। ২৫ মার্চের পরে যেসব মিলিটারি, পুলিশ, আনসার সদস্য পালিয়ে এসেছিলো তাদের এবং কৃষক, ছাত্র, জনতা, যুবক এদের নিয়ে মুক্তিবাহিনীর দল গঠন করেন। তিনিই সেই দলের কমান্ডার ছিলেন। আমাদের রাকুদিয়া গ্রামে আবুল কালাম ডিগ্রী কলেজে তিনিই সর্বপ্রথম মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ সেন্টার চালু করেন। বিশেষভাবে ছাত্র, কৃষক, যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে মুক্তিবাহিনীর শক্তি আরও জোরদার করেন।

২৪ এপ্রিল পাকবাহিনী নদী এবং সড়ক পথে বরিশালে আসে। তখন তাদের সাথে বিভিন্ন সময় সংঘর্ষ বাধে। এই ক্রোধের জের ধরে পাকবাহিনী রাকুদিয়া গ্রামে ঢুকে পড়ে। মো: রতন আলী শরীফকে না পেয়ে পাকবাহিনী তার দেড় বছরের ছেলেকে ধরে নিয়ে যায়। তখন তাকে তার বাহিনীসহ আত্মসমর্পন করতে বলা হয়। কিন্তু একজন দেশপ্রেমিক হয়ে তিনি এই প্রস্তাবে রাজি হননি। তখন তিনি বীরত্বের সাথে বলেছিলেন, দেশে অনেক লোক শহীদ হয়েছে। তাই আমার দেশের স্বার্থে আমি আমার ছেলেকে উৎসর্গ করলাম।

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি মো: রতন আলী শরীফের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম বৃহত্তর বরিশালে সুগন্ধা নদীর পশ্চিম পাড়ে দোয়ারিকা ফেরিঘাটের কাছে পাকবাহিনীর ঘাঁটি আক্রমণ করে মুক্তিবাহিনী এবং সেখানকার পাকবাহিনীর কিছু সদস্য আহত হয়। তারা তাদের অস্ত্র রেখে পলায়ন করে। সেদিন তার মুক্তিবাহিনীর দল ২৫টি রাইফেল ও বিপুল সংখ্যক গোলাবারুদ উদ্ধার করে। তখন মুক্তিবাহিনীর শক্তি আরও বৃদ্ধি পায়।

আগস্ট মাসের শেষের দিকে পাকবাহিনী দোয়ারিকা ফেরিঘাটের পূর্ব পাড়ে আরও একটি ঘাঁটি স্থাপন করে। পশ্চিম পাড়ের মুক্তিযোদ্ধাদের অতর্কিত আক্রমণে ৭ জন রাজাকার মারা যায়। সেখান থেকেও মুক্তিযোদ্ধারা অস্ত্রসহ গোলাবারুদ উদ্ধার করেন।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে মুক্তিযোদ্ধারা আবার পাকবাহিনীর দোয়ারিকা ফেরিঘাটের পূর্ব পাড়ের ঘাঁটি আক্রমণ করেন। সেখান থেকে বিপুল গোলাবারুদসহ ৩৫টি রাইফেল উদ্ধার করেন। সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি দিকে পাকবাহিনীর দোসররা পূর্ব পাড়ের গ্রামে লুটপাট করতে নামে। তখন মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমনে ৭ জন পাকবাহিনীর দোসর ধরা পড়ে। তারপর পাকবাহিনীর দোসরদের ধরে নিয়ে সন্ধ্যা-সুগন্ধা নদীর ত্রিমুখী কালিবাড়ি স্থানে মারা হয়।

অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে উজিরপুরের জয়শ্রী ঘাঁটি আক্রমণ করে এবং সেখান থেকে একজন রাজাকারকে ধরে নিয়ে গুলি করে মারা হয়। সেখানে দুইজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। পর্যায়ক্রমে পাকবাহিনীর সাথে মুক্তিযোদ্ধাদের রাকুদিয়া গ্রামে অনেক স্থানে সংঘর্ষ বাধে। এরপর তারা এই গ্রাম থেকে ছত্রভঙ্গ হয়ে বিভিন্ন স্থানে পালিয়ে যায়।

নভেম্বরের শেষের দিকে দোয়ারিকা ফেরিঘাটের পূর্বপাড়ের ঘাঁটি থেকে রাজাকার, আল-বদর, আলশামসসহ ৯০ জন অস্ত্রসহ মো: রতন আলী শরীফের দলের কাছে আত্মসমর্পন করে।

৩ ডিসেম্বর গৌরনদী থেকে পাকবাহিনী কমান্ডার ক্যাপ্টেন কাহার-এর নেতৃত্বে ঘাঁটি ছেড়ে স্থলপথে বরিশালের দিকে রওয়ানা হয়। তখন পথিমধ্যে কমান্ডার কাহারের দলের সাথে মুক্তিবাহিনীর রতন আলী শরীফের দলের ভোর ৭:০০টা থেকে ১:৩০মি. পর্যন্ত সম্মুখ যুদ্ধ হয়। ১.৩০ মিনিটের পরে পাকবাহিনীর সুইসাইড স্কোয়াড দলের প্রায় ৫০ জন স্টেনগানসহ দোয়ারিকা রাকুদিয়া গ্রামের ইরি ক্ষেতের ড্রেন দিয়ে গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের পিছন থেকে ঘিরে ফেলে। মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করে। এতে বেইজ কমান্ডার মো: রতন আলী শরীফ হাতে পায়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন। ঘটনাস্থলে দুজন মুক্তিযোদ্ধা মো: আবুল হোসেন এবং আবদুর রশীদ শহীদ হন। তারমধ্যে আবদুর রশীদের লাশ দাফন করা হয়। কিন্তু মো: আবুল হোসেনের লাশটি আর পাওয়া যায়নি। সেই লাশটি নদীতে ফেলে দেয়া হয়। পরে মুক্তিবাহিনীর অতর্কিত হামলায় তারা পশ্চিম পাড় থেকে পূর্ব পাড়ে চলে যায়। তখন রতন আলী শরীফের দল আবার পূর্ব পাড়ে ঘেরাও করে। পাকবাহিনীর বরিশাল যাওয়ার পথকে রুদ্ধ করে দেয়া হয়। তাদের ৪-৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত আটকে রাখা হয়। পরে ৫ ডিসেম্বর বিকালে তাদেরকে বরিশাল নিয়ে যাওয়া হয়। এভাবে বৃহত্তর বরিশাল ৮ ডিসেম্বর পুরোপুরিভাবে শত্রুমুক্ত হয়। মুক্ত হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে পাকবাহিনী অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা দেয়।

আমি গৌরবান্বিত যে, আমার বাবুগঞ্জ থানার জাহাঙ্গীর নগর ইউনিয়নের ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর একজন বীরশ্রেষ্ঠ। বাবুগঞ্জ থানায় আরও তিনজন বীর প্রতীক উপাধি পেয়েছেন। তার মধ্যে সবচাইতে বড় গৌরব আমার চাচা মো: রতন আলী শরীফ একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং সম্মান পেয়েছেন বীর প্রতীক হিসেবে।

সূত্র : জ ১৪১৩৩

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
আফসানা সিদ্দিকা আন্নি	**মো: রতন আলী শরীফ (বীর প্রতীক)**
বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	বয়স: ৬২ বছর
শ্রেণি-নবম, ক রোল নং- ১৪	সম্পর্ক: চাচা

আমার ভগবান, আমার ভগবান

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি অতি স্মরণীয় ঘটনা। তার স্মৃতিচারণ অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তার কারণ আমি বলছি:

বরিশাল জেলার অন্তর্গত চাখারের হাটে একটি দৃশ্য আমার দাদা নিজের চোখে দেখেছিলেন। হাট চলাকালীন এক হিন্দু মজুর প্রায় দেড়মন জ্বালানি কাঠ মাথায় নিয়ে হাটে বিক্রির জন্য আসছিল। এমন সময় পাকিস্তানি একটি ছোট বাহিনী তার সামনে এসে পড়ে। ওই বাহিনীর কয়েকজন সিপাহী তার জাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। ওই মজুর উত্তর দেয় যে, সে মুসলমান। ওই সময়ে হাটের এক বখাটে ছেলে বলে ওঠে, "স্যার! ও হিন্দু।" বলার সাথে সাথে পাকিস্তানিরা তার উপর অমানুষিক অত্যাচার করে। ওই মজুর হিন্দু কিনা তা তারা পরীক্ষা করে। পাকিস্তানিদের সামনে প্রমানিত হল যে, সে হিন্দু। এমতাবস্থায় আমার দাদা ওই বাহিনীর প্রধানকে বলেন, "ইসলামে আছে, জান বাঁচানোর জন্য মিথ্যা কথা বলা যায়।" আমার দাদা আরও বলেন, "ও হিন্দু হয়ে মুসলমানদের খেদমত করে। তার প্রতিদানে কি এই অমানুষিক অত্যাচার?"

পাকিস্তানি বাহিনী আমার দাদার কথায় বিশ্বাস করে ওই মজুরকে ছেড়ে দেয়। তার অনিবার্য মৃত্যু থেকে সে রক্ষা পেয়ে যায়। আজও সেই লোক প্রতিবন্ধী হয়ে জীবিত আছে। সে বর্তমানে বানরীপাড়া থানার অন্তর্গত খলিসাকোটা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের সামনে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে চিনাবাদাম বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করে। আমার দাদার সাথে দেখা হলেই সে বলে, 'আমার ভগবান, আমার ভগবান। আমার জান ইনিই বাঁচাইয়াছিলেন।'

এভাবে ১৯৭১ সালের অনেক মানুষই অমানুষিক অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন। ত্রিশ লাখ মানুষের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা।

সূত্র : জ ১৪১৫৪

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
সৈয়দা নাজরীন হাসান টিনা	**সৈয়দ আখতার হোসেন**
বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	বয়স: ৮০ বছর
শ্রেণি-৭ম, ক রোল নং- ২	সম্পর্ক: দাদা

আমার নানা আজ বৃদ্ধ

একটি মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের উৎপত্তি। নানার মুখে শুনেছি একথা। তখন আমার মাও ছিলেন শিশু। আমার নানা এম.এ খালেকের বর্তমান বয়স ৬৮ বৎসর। তখন তিনি ছিলেন ২৯ বছরের যুবক। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় থানা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার হিসেবে দিনাজপুরে কর্মরত ছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে চাকুরিরত অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন।

নানার মুখে শুনেছি ২০ এপ্রিল দিনাজপুর শহর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর করায়ত্ত হয়ে যায় এবং বিহারিদের অত্যাচার বেড়ে যায়। বিশেষ করে সৈয়দপুরের বিহারিরা পাকসেনাদের সাথে একত্র হয়ে বাঙালি মা-বোনদের প্রতি পাশবিক অত্যাচারসহ লুটতরাজ আরম্ভ করে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে নানা ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএম হলের খেলাধূলা সম্পাদক ও ছাত্রলীগের একজন সক্রিয় কর্মী। তাই তার জীবন বাঁচানো দূরূহ হয়ে পড়ে। সুদূর দিনাজপুর থেকে বরিশাল আসা সম্ভব নয় ভেবে ঠাকুরগাঁও-এর রুহিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু নুরুল ইসলামের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। নানার কাছে অফিসের কিছু টাকা ছিলো। তাই নিয়ে রুহিয়ার উদ্দেশে ঠাকুরগাঁওগামী একটি বাসে উঠে পড়েন। যখন নানা দিনাজপুরের ১০ মাইল মোড় পার হচ্ছিলেন তখন দেখেন পাক হানাদার বাহিনী ও বিহারিরা রাস্তার পাশে একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে একটি লোককে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মারছে আর উল্লাস করছে। পাক হানাদাররা নানাদের বাসটি থামিয়ে সবাইকে তল্লাশি শুরু করলো। তল্লাশি শেষে নানাকেসহ আরও ৪ জনকে আটকে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। উপায়ন্তর না দেখে নানা তার পকেটে থাকা থানা পরিকল্পনা অফিসার হিসেবে সরকারি প্রদত্ত আইডেন্টিটি কার্ড দেখান। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করার পর নানাকে তারা বাসে যেতে দেয়। বাকী তিনজনের অবস্থা কি হয়েছিলো তা আর নানা বলতে পারেন না। নানা যখন ঠাকুরগাঁও বাসস্ট্যান্ডে তখন তার চারপাশের গ্রামগুলিতে আগুন জ্বলছে। পাকবাহিনী সকাল ১১ টায় ঠাকুরগাঁও দখল করে নিয়েছে এবং সেখানে যা পেয়েছে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। বাস আর সামনে যেতে রাজি হলো না। নানাসহ বাসের ২০/২২ জন যাত্রী নেমে পড়লেন। রুহিয়া তখনও ১২ মাইল দূরে। ওই বাসে রুহিয়ার এক যাত্রী ছিলো, আসাদ তার নাম। সে নুরুল ইসলাম বোম্বার্ডকে চিনতো। আসাদের সাথে নানা রাস্তা ছেড়ে গ্রামের মধ্যে দিয়ে রুহিয়া রওয়ানা হলেন। অজানা অচেনা গ্রামের মেঠো পথ, সাথের লোকটি অপরিচিত। একমাত্র ভরসা আলাহ্। দুপুর তিনটার দিকে এক বিরাট বাড়িতে নানা পৌঁছলেন। এক বৃদ্ধ ও ৩৫-৪০ বছরের এক জন বসে আছেন। আসাদ নানাকে বলেছেন এটা চিত্রনায়ক রহমান সাহেবের বাড়ি। সন্ধ্যে ছয়টার দিকে বোম্বার্ডের বাড়ি পৌঁছলেন নানা।

রুহিয়া তিন দিন অবস্থানের পর নানা, নুরুল ইসলাম বোম্বার্ড, আনোয়ার মাস্টার (রুহিয়া হাই স্কুলের শিক্ষক) সাইদুর রহমান মনি, নানার বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধু একত্রে বাংলাদেশের সীমান্ত অতিক্রম করে উত্তর দিনাজপুরের বালুরঘাট চলে আসেন। তখন বালুরঘাটে ট্রেনিং চলছিলো। আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য আবদুল জলিল ওই ক্যাম্পের দায়িত্বে ছিলেন। নুরুল ইসলাম বোম্বার্ডের সাথে তার পরিচয় ছিলো। নানা ও অন্যান্য তিন জনের পরিচয় পেয়ে সিদ্ধান্ত হলো নানাদের বিস্ফোরণের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। ১০/১২ দিন নানা ও তার দল উত্তর

দিনাজপুর ঘুরে বেড়িয়েছেন। শরণার্থীদের সাহায্য করেছেন। শরণার্থীদের বিভিন্ন ক্যাম্পে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন।

১৫ মে, ১৯৭১ বালুরঘাট ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগদান করেন আমার নানা ও তার বন্ধুরা। তিন মাস চলে এই প্রশিক্ষণ। এ সময় নানাদের থ্রি নট থ্রি, পি কে বিস্ফোরণ, এসএমজি চালানো, গ্রেনেড নিক্ষেপ, শারীরিক প্রশিক্ষণ, ভারী কিছু নিয়ে পাহাড় অতিক্রম করার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। গাছের গুড়ি কিংবা রাইফেল কাঁধে নিয়ে পাহাড় ডিঙ্গাতে এ ট্রেনিংয়ে বাধ্য করা হতো। দৈনিক ১২ থেকে ১৪ ঘন্টা চলতো এ প্রশিক্ষণ। রাতের আঁধারেও চলেছে এ প্রশিক্ষণ। রাতের অন্ধকারে সহযোদ্ধা ও শত্রু চিহ্নিত করার জন্যই মূলত এ রাতের প্রশিক্ষণ। রাতের প্রশিক্ষণে সবাইকে একটি করে পাসওয়ার্ড শিখিয়ে দেয়া হতো। কখনও কখনও সেই পাসওয়ার্ড হতো লাল গোলাপ, রজনীগন্ধা বা অন্য কিছু। এই পাসওয়ার্ডের মধ্য থেকে কে সহযোদ্ধা বা কে শত্রু তা চিহ্নিত করা যেতো। প্রশিক্ষণের দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন হায়দার, অত্যন্ত অমায়িক ব্যক্তি ছিলেন তিনি। মাঝে মাঝে উনি নিজেও রাতে বের হতেন পরীক্ষা করার জন্য। লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরেই নানা ট্রেনিং করেছেন।

২০ আগস্ট ১৯৭১ নানাদের ট্রেনিং শেষ হয়। ট্রেনিং শেষে নানা বরিশাল জেলার কোনো এক দলের সাথে যুদ্ধ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেও নুরুল ইসলাম বোম্বার্ড এবং তৎকালীন যুবলীগ নেতা রুহিয়া নিবাসী রমেশ চন্দ্র সেন (বর্তমান আওয়ামী সরকারের পানি সম্পদ মন্ত্রী) ছিলেন স্থানীয় মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সংগঠক। তারা নানাকে কিছুতেই ছাড়লেন না। নানা থেকে গেলেন উত্তর দিনাজপুরেই। রমেশ চন্দ্র সেনের পরামর্শেই রুহিয়া ও রামনাথ হাটের (ঠাকুরগাও জেলা) মধ্যবর্তী ১০০ ফুট ব্রিজটি উড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সিদ্ধান্ত হয় গেরিলা অপারেশনের মাধ্যমে ব্রিজটি উড়িয়ে দিতে হবে। ওই ব্রিজটি যদি ধ্বংস করা হয় তা হলে পাক সেনারা রুহিয়া থেকে রামনাথ হাট তথা সীমান্তের দিকে এগুতে পারবে না। ঠিক হয় নানাদের নেতৃত্বে থাকবেন ক্যাপ্টেন হায়দার। গেরিলা অপারেশনের গ্রুপটা থাকে খুবই ছোট। তারিখ ধার্য করা হয় ৮ সেপ্টেম্বর। নানারা পাঁচ জনের দুটি গ্রুপে এই অপারেশন চালাবেন। সাইদুর রহমান মনি ও গণেশ সেন ছিলেন এক গ্রুপে। এদের দায়িত্ব ব্রিজের উপর পাহারারত রাজাকারদের ঘায়েল করা, আর দ্বিতীয় গ্রুপের দায়িত্ব ব্রিজের খাম্বার সাথে ডিনামাইট ও বিস্ফোরক বেঁধে উড়িয়ে দেয়া। দুটি গরুর গাড়িতে করে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি নিয়ে ৮ সেপ্টেম্বর বিকাল ৫টায় নানাদের গেরিলা দল উত্তর দিনাজপুরের বালুরঘাট হতে রওয়ানা হয়। প্রত্যেকের কাঁধে চাইনিজ রাইফেল আর মর্টার। ভারী অস্ত্র নিয়ে চলছেন নানাদের গেরিলা দল। গ্রামবাসী অবাক হয়ে দেখছেন। রমেশ চন্দ্র সেন সাহসী ও বিশ্বাসী ৮ জন যুবককে সাহায্য করার জন্য পাঠালেন। তাদের দায়িত্ব ছিলো নানারা ব্রিজের কাছাকাছি পৌঁছলে তাদের সাথে জোরে সারেন্ডার স্লোগান বলে চিৎকার করা। রাজাকারদের অবস্থান নানারা পূর্বেই জেনে নিয়েছিলেন। রাত ১২.০১ মিনিটে অপারেশনের সময় নির্ধারিত হয়। ঠিক ১২টার সময় নানাদের দ্বিতীয় দলটি ব্রিজের নিচে পৌঁছে যায়। উপরের দলটি হামাগুড়ি দিয়ে কাছে পৌঁছে স্থানীয় কিছু যুবকসহ এক সাথে অস্ত্র ঠেকিয়ে সারেন্ডার বলার সাথে সাথে নানাদের অপর দলটি ব্রিজের উপরে থাকা রাজাকারদের গুলি ছোড়া শুরু করে। সাথে সাথে কয়েকজন মারা যায়। কয়েকজনকে ধরা হয়। তাদের না মেরে তাদের দ্বারাই নানারা মর্টার ও ডিনামাইট বসানোর কাজটা সেরে নেন। পরে যখন বাস্ট করানো হলো তখন বিকট আওয়াজে ধ্বংস হয়ে যায় ব্রিজটি। বিকট আওয়াজের সাথে সাথে রুহিয়া

অবস্থানরত পাকসেনারা এলোপাথাড়ি গুলি ছোড়া শুরু করে। এমন কি কামানের গোলাও ছুড়ে। একটি গোলা নানার বাম পায়ে লাগলে নানা আহত হয়ে পড়ে যান। নুরুল ইসলাম বোম্বার্ড তাঁকে কাঁধে করে রাত চারটার দিকে ক্যাম্পে পৌঁছান। পরদিন নানাকে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয় ভ্রাম্যমাণ হাসপাতালে। জখম গুরুতর ছিলো না, ১৫ দিনে নানা সুস্থ হয়ে ওঠেন। ওই হাসপাতাল পরিদর্শনে এসেছিলেন তৎকালীন মেহেরপুরের এসডিও সিএসপি অফিসার তৌফিক এলাহী চৌধুরী। বর্তমানে তিনি মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা। তিনি এবং নানা ১৯৫৯ সনে বরিশাল জিলা স্কুল হতে মেট্রিক পাশ করেছিলেন। চৌধুরী নানাকে চিনতে পারেন এবং তাকে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বালুরঘাট-এর শরণার্থী শিবিরের সার্বিক দয়িত্ব পালন করার জন্য নির্দেশ দেন। ডিসেম্বরের বিজয় দিবস পর্যন্ত নানা ঐ দায়িত্ব পালন করেছেন।

আমার নানা আজ বৃদ্ধ। স্মৃতি রোমন্থন করে চোখের পানি ফেলেন আর বলেন, যে উদ্দেশ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম তা কি আমরা সফল করতে পেরেছি? আমরা কি মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে পেরেছি? নানার সহযোদ্ধাদের মধ্যে নুরুল ইসলাম বোম্বার্ড ও সাইদুর রহমান মনি আজ আর পৃথিবীতে নেই। তাদের রুহের মাগফেরাতের জন্য নানা সকলের কাছে দোয়া প্রার্থনা করেন।

সূত্র : জ- ১৪৮৭৫

সংগ্রহকারী:	বর্ণনাকারী:
ইরাম হাসান	**এম.এ. খালেক**
বরিশাল জিলা স্কুল	বয়স: ৬৮, সম্পর্ক: নানা
৬ষ্ঠ শ্রেণি, শাখা: ক, রোল: ৩৫ (প্রভাতী)	

তুমি হিন্দু না মুসলমান

২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে গভীর রাতে শুরু হলো সামরিক জান্তার আক্রমণ। সেই রাতে পাকিস্তানিরা অনেক মানুষ হত্যা করে। অনেক ঘর-বাড়ি এবং দোকানপাট আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। পাকিস্তানিরা মহিলাদের অনেক নির্যাতন করে। তাদের ভয়ে মহিলারা পাট ক্ষেতে মাটির গর্তে গিয়ে পালাতেন।

একদিনের ঘটনা: আমার নানা ফজরের নামাজ পড়ে ক্ষেতে পাট কোপাতে গেলেন। তখন ১১টার মতো বাজে। তারপরে পাকিস্তানিরা রাস্তা দিয়ে যাবার সময় তাকে দেখে তার কাছে গেলো। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলো, তুমি হিন্দু না মুসলমান। তখন তিনি বললেন, আমি মুসলিম। তখন তিনি চার কালেমা পড়ে তাদেরকে শোনালেন। তখনও তারা বিশ্বাস করলো না। তাকে উলঙ্গ হতে বললো। তিনি বললেন, আমি উলঙ্গ হতে পারবো না। তখন তাকে গুলি করলো। তিনি পাট ক্ষেতে মারা গেলেন। সেখানে একটা গরু ছিলো, সেটাকেও গুলি করলো।

সূত্র : জ ১৪৪৬৮

সংগ্রহকারী
আল-আমিন হাওলাদার
মাধবপাশা চন্দ্রদ্বীপ হাই স্কুল ও কলেজ
৮ম শ্রেণি, ক শাখা, রোল: ১৬

বর্ণনাকারী
রিজিয়া বেগম
গ্রাম: বাদলা, পোস্ট: দেহেরগাতি
উপজেলা: বাবুগঞ্জ, জেলা: বরিশাল

বাবা সাবধানে যাস

বরিশাল জেলায় পাকবাহিনী এসে ঘাঁটি নিয়েছে। তারপর তারা বরিশাল জেলার বিভিন্ন জায়গায় ক্যাম্প করে। রহমতপুর ক্যাডেট কলেজের ওখানে ক্যাম্প তৈরি করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের কিছু বেঈমান রাজাকার তাদের সাথে হাত মিলায়। আমাদের মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করে। রাজাকাররা পাকবাহিনীর কাছে মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়ি চিনিয়ে দেয় এবং তাদের পাকবাহিনীর সাথে হাত মেলানোর জন্য আহ্বান জানায়। কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাকে তাদের ক্যাম্পে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলে, তারা অস্বীকার করায় তাদের হত্যা করে। সব মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়। তখন সবাই নিরুপায় হয়ে জানমাল নিয়ে ছুটাছুটি করতে থাকে।

চারিদিকে শুধু কান্না, হাহাকার। খাওয়া দাওয়া নেই, এতেও অনেক মানুষ মারা যায়। চারদিকে শুধু গুলির আওয়াজ। তখন বুকের ভেতর ভয়ে কাঁপতে থাকে, কেউ ঘর হতে বের হয় না। মা-বাবা, ভাই-বোন না খেয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। বাবা-মার কষ্ট দেখে কে আর বসে থাকতে পারে!

একদিন আমি আমার বাবার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে সদাই আনতে যাই। মা বলে, বাবা সাবধানে যাস। তখন আমার বুক ধড়ফড় করে। তবু মাকে তা বুঝতে দেইনি। বের হই বাজার করতে। বাজার থেকে তেল, আটা, ময়দা, মুড়ি, চিনি ইত্যাদি আনি। আসার পর শুনি গুলির আওয়াজ। গুলির আওয়াজ শুনে আর সামনে যাইনি। এক পাশে দাঁড়িয়ে দেখি পাকিস্তানিরা কোথায় আছে। যখন গুলির আওয়াজ কম তখন বাড়ি রওনা হই। হঠাৎ ফেরার পথে পাকিস্তানিরা আমার সামনে পড়ে। তখন মনে মনে বলি, এই বুঝি আমার প্রাণ আর রইলো না। দু'চোখ থেকে পানি ঝরতে থাকে। তবু নিজের প্রাণে সাহস যোগাই। রাজাকার ও পাকবাহিনী আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি কি মুক্তিযোদ্ধা? তোমার কি কোনো আপনজন আছে যে মুক্তিযোদ্ধা? আমি বললাম যে, না হুজুর, আমি মুক্তিযোদ্ধা না। আমার কোনো আপনজন কেউ মুক্তিযোদ্ধা নয়। তাছাড়া মুক্তিযোদ্ধা কি তা তো চিনি না। তারপর তারা বলে, তুই সত্য কথা বলছিস? আমি বললাম, না হুজুর আমি কখনো মিথ্যা কথা বলি না। তারপর আমাকে কোনো প্রশ্ন না করে রাস্তায় দাঁড়াতে বলে। দাঁড়ানোর কারণ গুলি করে মারবে। আমার সামনে অনেককে মেরে ফেলে। আলাহর অশেষ রহমতে এক রাজাকারের মনে দয়া হলো। সে বললো, ওকে মারবে না, ওকে ওর মা-বাবার কাছে পাঠিয়ে দাও, ওর কোনো দোষ নেই। তারপর আমি বাড়ি ফিরলাম। তখন আবার শুনি গোলাগুলি। পিছে ফিরে দেখি ওদের সবাইকে মেরে ফেলেছে। তারপর তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলাম। দেখি মা-বাবা সবাই কান্নাকাটি করছে। আমাকে দেখে তাদের মুখে

হাসি ফুটে ওঠে। আমাকে বুকে টেনে নিয়ে বলে, বাবা তুই এসেছিস, আমি মনে করেছিলাম তুই নেই।

সূত্র : জ ১৪৪৭৬

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
হাসিবুর রহমান জুনায়েত	**খলিলুর রহমান শরীফ**
মাধবপাশা চন্দ্রদ্বীপ হাই স্কুল ও কলেজ	গ্রাম: পরশা, পোস্ট: মাধবপাশা
৮ম শ্রেণি, ক শাখা, রোল: ০৯	উপজেলা: বাবুগঞ্জ, জেলা: বরিশাল

চোখের জলে বালিশটা ভিজে গেল

১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধের আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা। আমার মুক্তিযুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

১৯৭১ এর ফেব্রুয়ারি মাসে আমি সৈয়দ মো. শাহজাহান, বড় ভাই সৈয়দ মো: সোবহান ও আমার গ্রামের মফিজউদ্দিন আমরা এই তিন জন বরিশাল বেলেজ পার্ক ময়দানে এক মাস আনসার ট্রেনিং সমাপ্ত করে বাড়িতে ফিরে আসি। ফিরে আসার মাত্র কয়েকদিন পর ৭ মার্চ শুনতে পাই, বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার জন্য বাংলার সর্বস্তরের মানুষকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। এই ঘোষণা পাওয়ার সাথে সাথেই আমাদের ৯নং সেক্টর কমান্ডার সাহসী বীর সৈনিক মেজর এম এ জলিল সমগ্র বরিশালবাসীকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য বরিশাল বেলেজ পার্কে আসার জন্য অনুরোধ জানান। তখন আমার বয়স হবে ২১ বৎসর। ঘোষণা পাওয়ার সাথে সাথে আমরা উক্ত তিনজন বেলেচ পার্কে যাই এবং মেজর এম এ জলিলের সাথে দেখা করি। আমরা পূর্বেই আনসার ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছিলাম জেনে মেজর জলিল খুশি হয়ে আমাদেরকে তার সাথে রাখেন। মুক্তিযোদ্ধার খাতায় আমাদের নাম লিস্ট করে সারাদিন বেলেচ পার্কে থাকার পর রাত্র আটটার পরে তিনি আমাদের কিছু ট্রেনিংপ্রাপ্ত লোকদের নিয়ে বরিশাল যান। তখন রাত্র প্রায় দুইটা হবে। আমি আমার বড় ভাই মফিজ ও আরো অচেনা বহু লোক ছিলেন। ওই রাত্রে আমরা একটা করে থ্রি নট থ্রি রাইফেল ও ৫ রাউন্ড করে গুলি পাই। ভাবলাম আমাদের ব্যাচ হয়ত ভোলা চলে যাবে। আর হয়ত আমার শেষ যাওয়া হবে এটা। নীরবে চোখের জলে বালিশটা ভিজে গেল। তখন গভীর রাত, চোখে ঘুম নেই। কমান্ডার রব আমাদের রুমে এসে দেখেন আমি তখনও ঘুমায়নি। সজাগ রয়েছি। তিনি আমাকে বললেন যে, তুমি এখনও ঘুমাও নাই?

এইভাবে কয়েকদিন যাবার পর মেজর জলিল হঠাৎ একদিন এসে আমাদের বললেন যে, পাকসেনাদের যুদ্ধজাহাজ অতি নিকটে এসে গেছে। বাংলাদেশের সমস্ত জায়গায় প্রচন্ড যুদ্ধ চলছে। শুধু বরিশালে এখনও পর্যন্ত পাকসেনারা উঠতে পারে নাই। তোমরা সবাই রেডি থাকো। আমি আজ ভারত যাচ্ছি। এই বলে মেজর জলিল চলে গেলেন। আমরা সবাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলাম। হঠাৎ দুই দিন পর সকাল ১০টার সময় আমাদের কমান্ডার বললেন, তোমরা তোমাদের হাতিয়ার ও গোলা বারুদ নিয়ে তাড়াতাড়ি মাঠে ফলিন হও, আমরা যুদ্ধ করতে নদীর

তীর যাব। কারণ পাকসেনাদের জাহাজ তালতলীর কাছাকাছি এসে পড়েছে। এটা শুনে আমরা মুক্তিযোদ্ধারা সবাই যার যা ছিল তাই নিয়ে মাঠে ফলিন হলাম। আমি তাড়াতাড়ি করে আমার কাপড়ের বড় একটা ব্যাগে সব গুলি ভরে নিলাম। এ সময় তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে আমার হাতের তালুর মধ্যে দারুণভাবে কেটে যায়। তাড়াতাড়ি গায়ের জামায় হাতটা বেঁধে হাতিয়ারটা কাঁধে ও গুলির ব্যাগ মাথায় নিয়ে কমান্ডার রব-এর সাথে নদীর পাড়ে চলে যাই।

যুদ্ধ শুরু হয়। প্রচন্ড যুদ্ধ। পাকসেনাদের যুদ্ধ জাহাজ তালতলীর ঘাঁটে এসে পড়েছে। তুমুল বেগে গোলাগুলি শুরু হল। গুলিতে স্থানীয় লোকদের বহু ঘরবাড়ি পুড়ে গেল এবং উড়ে গেল। বেলা ৫টার সময় জানতে পারলাম পাকসেনাদের তিনটা যুদ্ধজাহাজ এসেছিল। তার মধ্যে একটা জাহাজ ডুবে গেছে। বাকি দুইটা জাহাজ পিছে চলে গেছে। আমাদের প্রতিরোধের মুখে পাকসেনারা টিকতে না পেরে দারুন বিপদে পড়ে গেল। তারা বহু চেষ্টা করেও বরিশালে উঠতে পারেনি। এরপর দেখা গেল যে, পাকসেনাদের ফাইটারগুলো এসে গেছে। তারা প্রচণ্ড বেগে বোমা ফেলছে এবং মেশিনগানের সাহায্যে গুলি ছুঁড়ছে। আমরা তখন ভাবলাম যে, আমরা তো বাঁচতে পারব না। তবে যুদ্ধ করেই মরতে প্রস্তুত। তাই প্রচণ্ড বেগে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এর কিছুক্ষণ পরে আবার দেখতে পারলাম যে, ফাইটারগুলো বোমা ফেলে যাচ্ছে আর হেলিকপ্টারে করে পাক সৈন্য নামিয়ে দিচ্ছে। তখন আমরা ভাবলাম যে, এখন আর আমাদের পাকসেনাদের সাথে যুদ্ধ করে টিকে থাকা সম্ভব নয়। তাই আমাদের কমান্ডার অর্ডার দিলেন যে, এখন থেকে পিছু হটতে হবে। আমরা কমান্ডারের নির্দেশের সাথে সাথে পিছু হটতে শুরু করলাম। তাতে কোন কোন সময় ক্রলিং দিতে হয়েছে। এইভাবে পিছু হটতে হটতে আমরা কমান্ডারসহ ৩৪ জন চলে এলাম ভিন্ন জায়গায়। এভাবে ঘুরে বরিশাল সোলনা গ্রামের মধ্যে এসে সবার পানির পিপাসা লেগেছিল। সেখানে এক বাড়ির পুকুর থেকে পানি পান করে মাধবপাশা দুর্গাসাগরের পাড়ে একটা বড় বটগাছের নিচে এসে সবাই বসে পড়লাম। কিছুক্ষণ রেস্ট করার পর কমান্ডার বড় সাহেব আমাদের নিয়ে মিটিং করলেন যে, এখন কোথা থেকে কোথায় যাওয়া যায়। এরপর ঠিক হলো যে রাত্র ৮টার পর আমরা সবাই বানারীপাড়া রওয়ানা দিব। সব ঠিকঠাক হলো। আমি তখন চিন্তায় পড়ে গেলাম। ভাবলাম এখান থেকে আমার বাড়ি মাত্র ৫ মাইল দূরে হবে। মা-বাবা, ছোট বোনটা ও আত্মীয়-স্বজন অবশ্যই কান্নাকাটি করছে। তারা সবাই জানে যে, বরিশালে প্রচন্ড যুদ্ধ চলছে তাই হয়ত আমরা কেহ বেঁচে নেই। এই সব ভেবে ঠিক করলাম আমি বানরীপাড়া যাব না। বাড়িতে চলে যাব। বাড়িতে গিয়ে আমরা নিজেরাই এলাকার লোকজন নিয়ে পার্টি গঠন করবো। আমার বড় ভাই, আমাদের গ্রামের মফিজ ভাই রূপাতলীতে আছে। হয়ত এখনো তারা যুদ্ধ করছে। তারা বেঁচে থাকলে এবং বাড়িতে আসলে আমাদের পার্টি চালাতে কোন চিন্তা ভাবনাই করতে হবে না। এবং যুদ্ধ করতেও কোন ভয় পেতে হবে না। কারণ আমার ভাইও আমার মতন বড় একজন সাহসী মুক্তিযোদ্ধা এবং রুপালী শিপের একজন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার। এই সব ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দেখি আমার খালাতো ভাই আর রব হাং বাড়ি থেকে বের হয়ে আমার কাছ দিয়ে যাচ্ছে। আমাকে দেখেই হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো এবং আমার কাছে আসল। বলল, ভাই আপনি বেঁচে আছেন? আমি বললাম হ্যাঁ, আল্লাহ রেখেছেন। তুই কেমন আছিস? রব বলল, ভাল আছি। তারপর আমি বললাম, কোথায় গিয়েছিলি? রব বলল, বোনের বাড়ি গিয়েছিলাম। এখন বাড়ি যাচ্ছি। রবকে আমার কাছে বসালাম এবং তাদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলাম। এর সাথে সাথে ওর গায়ে হাত বুলাতে লাগলাম কারণ রব ছিল

আমার চেয়ে অনেক ছোট তাই ওকে খুব স্নেহ করতাম। ওকে কাছে বসিয়ে বললাম, তুই আমার সাথে আমাদের বাড়িতে যাবি? আমি তোকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাব কারণ গুলির ব্যাগটা আমি তোর মাথায় দিব। গুলির ব্যাগটা এত ভারী যে সারাদিন মাথায় টানার পর আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সাথে কাঁধে হাতিয়ারটাও ছিল। এ শুনে রব রাজি হল।

আমি ওকে পেয়ে ভাবলাম খুব ভাল হলো। এখন ওর দ্বারা গুলির ব্যাগটা আমি বাড়ি নিয়ে যেতে পারব। এরপর আমি কমান্ডারকে বললাম যে, স্যার, আমি বাড়িতে যাব। মা-বাবার সাথে দেখা দিয়ে আমি আবার চলে আসব। কমান্ডার সাহেব রাজি হলেন না। বললেন এখন আমরা বানরীপাড়া যাই, সেখানে থেকে কোথায় যাবি তা বানরীপাড়া গিয়ে ডিসিশন নিব। এ কথা শুনে মনটা দারুন খারাপ হলো। তখন রাত্র প্রায় আটটার মতন হবে। ভাবলাম পালিয়ে যাব, নতুবা যাওয়া যাবে না। বুদ্ধি ঠিক হলো, এক ফাঁকে ছোট ভাই রব এর মাথায় গুলির ব্যাগটা তুলে দিলাম আর তাড়াতাড়ি সেখান থেকে বের হয়ে এসে রবকে সাথে নিয়া রাত ৮টার পরে বাড়িতে এসে হাজির হলাম। গুলির ব্যাগটা মাথায় নিয়ে আসতে রব-এর বহু কষ্ট হয়েছিল।

বাড়িতে এসে দেখি মা-বাবা ও ছোট বোনটা পাগলের মতন হয়ে গেছে। তারা সবাই কান্নাকাটি করছে আর বলছে, আমার বাবারা মনে হয় কেউ বেঁচে নেই। সাথে এলাকার বহু লোকজন বসে রয়েছে। তারা সবাই বাবা-মাকে ঘিরে রয়েছে। তাই বাবা-মা প্রথম আমাকে দেখতে পারে নাই। বরিশালে দারুণভাবে যুদ্ধ লেগেছে শুনতে পেয়ে বাবা-মা বার বার আমাদের দেখতে বরিশাল যেতে চেয়েছিল। কিন্তু আসা হয় নাই। হঠাৎ আমাকে দেখা মাত্র বাবা-মা আমাকে জড়িয়ে ধরে আরো জোরে কেঁদে উঠল। আর বলিতে লাগল, বাবা তুই বেঁচে আছিস। এ শুনে আমি তখন মুখে কিছু বলতে পারলাম না। তখন আমার চোখ থেকেও অশ্রু ঝরতে লাগল। এরপর বাবা জিজ্ঞাসা করল, তোর বড় ভাই কোথায় আছে? তার কি কোন খোঁজ খবর রাখতে পেরেছিস? আমি বলিলাম, বড় ভাই তো রূপালী শিপে রয়েছে, সেখানে তার কাছে যেতে পারিনি। তার সাথে দেখা করতে পারিনি। জানিনা সে কেমন আছে। আমাকে পেয়ে মা ও ছোট বোনটা কিছু সময় শান্ত থাকার পর আবার তারা বড় ভাইয়ের জন্য কান্নাকাটি করতে লাগল। আমি বাবা-মাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, আপনারা আল্লাহর নাম স্মরণ করেন। কাঁদবেন না, দেখবেন আমার মত বড় ভাইও হঠাৎ এসে যাবে। আমার মন বলে বড় ভাই বেঁচে আছে। বাবা-মাকে এইভাবে সান্ত্বনা দিতে থাকি। এভাবে রাত্র ৯টা বেজে গেল। হঠাৎ দেখি আমার বড়ভাই একটা থ্রি নট থ্রি রাইফেল ও ৫০ রাউন্ড গুলি নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হল। তখন আমরা তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকি। ভাইও কাঁদছিল। এরপর আশেপাশে বহু লোকজন আমাদেরকে দেখতে এল। কিছুক্ষণ পরে কান্না থেমে গেল।

ভাই আমার বিস্তারিত সংবাদ জানল, আমিও তার সংবাদ জানলাম। এরপর দুই ভাই চিন্তা ভাবনা করে ঠিক করলাম আমরা নিজেরাই লোকজন নিয়ে পার্টি গঠন করে যুদ্ধ শুরু করে দেব। কারণ আমার কাছে অনেক গুলি রয়েছে। তাই কোন চিন্তা-ভাবনার দরকার নেই। এছাড়া আমাদের গ্রামের মফিজ উদ্দিনও হাতিয়ার ও ৫০ রাউন্ড গুলি নিয়ে সবেমাত্র বাড়িতে উঠেছে। এখন আমাদের কোন ভয় ডর নেই। ভাই বলল, তাই হবে।

তখন সমগ্র বরিশালে পাকসেনা ঢুকে পড়েছে। এর মধ্যে আবার গ্রামে-গঞ্জে পুরোদমে ডাকাতি, লুণ্ঠন, নারী নির্যাতন শুরু হয়েছে। একদিকে পাক সেনাদের অত্যাচার অপর দিকে ডাকাতের অত্যাচার। যাতে করে বহু লোকজন মারা গেছে। তারা সম্পদ লুটে নিচ্ছে আর মানুষ

দিশেহারা হয়ে পড়েছে। এই সব ডাকাতের মধ্যে আমাদের পাশের গ্রামের অনেক ডাকাত রয়েছে। আমরা তাদের সবাইকে চিনতাম। তারা মুক্তিযুদ্ধে নাম দিয়েছে। হাতিয়ার নিয়ে গ্রামের বাড়ি চলে এসে পুরোদমে ডাকাতি শুরু করে দিয়েছে। তারা বহু লোকজন হত্যা করেছিল। শুধু ডাকাতি, হত্যা নয় তারা নারী নির্যাতন করেছে প্রচুর। এ দেখে আমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। একদিকে পাকসেনাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে অন্যদিকে ডাকাতের সাথে। বড় চিন্তার মধ্যে পড়ে গেলাম। সব কষ্ট সহ্য করা যায় কিন্তু চোখের সামনে নির্যাতন সহ্য করার মতো নয়। তাই কষ্টে ও দুঃখে মনের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল।

মফিজ উদ্দিন, আমি, বড়ভাই আমরা তিনজন আমাদের সহযোগী হিসেবে আলম মিয়া, মতি, জাহাঙ্গীর, মজিবর, হাবিব হোসেন, ইউসুফ মোল্লা, মান্নান, এছাক কাজী, শাহজাহান, এচমাইল নেগবান, এছাক, হোসেন, আমজার, কালু, আজহার হাং, মান্নান, আলি সরদারসহ আরো অনেককে নিয়ে শক্তিশালী দল গঠন করলাম এবং গ্রুপে ভাগ করে দিলাম। গ্রামে পাহারা দিলাম, ডাকাতরা যেন ডাকাতি ও নারী নির্যাতন করতে না পারে। এরপর ডাকাতের এক জনকে ডেকে এনে বলি যে, তোমরা ডাকাতি বন্ধ কর। নারী নির্যাতন বন্ধ কর। তোমরা মুক্তিযুদ্ধে নাম দিয়েছো। তোমাদের উচিত মুক্তিযুদ্ধ করা। তোমাদের ডাকাতি করা উচিত নয়। তোমরা আমাদের সাথে যোগ দাও এবং আমাদের সাথে যুদ্ধ কর এবং দেশকে মুক্ত কর। এলাকার মানুষদের তোমরা হয়রানি করো না। তাহলে তোমরা আমাদের হাত থেকে রেহাই পাবে না। এতো বলার পরও তারা আমাদের কথায় রাজি হলো না। ডাকাতি, হত্যা, নারী নির্যাতন করেই চললো। অনেক অনুরোধ করে বুঝিয়ে বলা সত্ত্বেও তারা আমাদের কথায় কর্ণপাত করে না। ভাবলাম এদের ভালো পথে আনা যাবে না। তারপর আমরা এ্যাকশন নিলাম। ডাকাতি বন্ধ হল। এরপর যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করলাম।

সূত্র : জ ১৪৪৯৩

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
হাফিজুল ইসলাম (সজিব)	**সৈয়দ শাহজাহান**
মাধবপাশা চন্দ্রদ্বীপ হাই স্কুল ও কলেজ	গ্রাম: পাংশা, পোস্ট: মাধবপাশা
৯ম শ্রেণি, মানবিক শাখা, রোল:০৬	উপজেলা: বাবুগঞ্জ, জেলা: বরিশাল

খ্রিস্টানদের ক্রুশ গলায় পরেছিল

১৯৭১ সালে হানাদার পাকিস্তান বাহিনী যখন আমাদের এই গ্রামে ঢুকে তখন অনেক হিন্দু লোক পালিয়ে গিয়েছে। আবার অনেক হিন্দু আমাদের কাছে এসে আশ্রয় নিয়েছিল। আশ্রয় নিয়ে তারা বেঁচে গিয়েছিল। কারণ আমরা ছিলাম খ্রিস্টান। পাকিস্তানি বাহিনী যখন আমাদের বাড়িতে আসে তখন আমরা উঠানে বসে ঘরের চাল বাঁধতেছিলাম। তারা এসে দেখল আমাদের ঘরের দরজায় যিশুর ছবি টাঙানো। তারা ঘরে ঢুকে সব দেখল। কিছু হিন্দু আমাদের খ্রিস্টানদের ক্রুশ গলায় পরেছিল। যাতে তারা বুঝতে না পারে যে তারা হিন্দু। এই হিন্দুদেরই কয়েকজন আত্মীয় আমাদের বাড়ির মাচার উপরে যে ডুলি ছিল সেই ডুলির মধ্যে লুকিয়েছিল। একজন

হিন্দু লোক বাঁচার জন্য রাজাকারদের সাথে হাত মিলিয়েছিল। কে কোন জায়গায় লুকিয়েছিল তা সব সে বলে দিয়েছে।

এক সময় পাকিস্তানিরা সাগর পাড়ে একটি মেশিনগান বসিয়েছিল। তারা সাহাপাড়া ধ্বংস করে দিবে। কিন্তু আমাদের খ্রিস্টান ধর্মের কিছু লোক গিয়ে তা মানা করেছিল। কারণ তারা যদি মেশিনগান বসিয়ে শেল মারে তবে আমাদের খ্রিস্টান পাড়ার ক্ষতি হবে।

আমি তখন ছোট ছিলাম। তখন আমি ও আমার বোন, বর্তমানে যে রাজবাড়ী, সেখানে আমরা জাম্বুরা পাড়তে গিয়েছিলাম। হঠাৎ শুনি যে, পাকিস্তানি বাহিনীর গাড়ির শব্দ আসছে। আমরা যখন বুঝেছিলাম যে রাজাকাররা আসছে তখন আমরা জাম্বুরা ফেলে রেখে দৌড়ে গিয়ে সবাইকে খবর দিলাম যে, মিলিটারি আসছে।

এই মুক্তিযুদ্ধে অনেকে প্রাণ হারায়। রাজাকাররা অনেক মেয়েদেরকে নিয়ে নির্মমভাবে ধর্ষণ করে। এমনিভাবে লাখো শহীদের রক্ত ও অনেক মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি এই স্বাধীনতা।

সূত্র : জ ১৪৪৯৬

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
শিমসন বৈরাগী	**আলো রানী বৈদ্য**
মাধবপাশা চন্দ্রদ্বীপ হাই স্কুল ও কলেজ	গ্রাম: মাধবপাশা, পোস্ট: মাধবপাশা
৯ম শ্রেণি, মানবিক শাখা, রোল: ০২	উপজেলা: বাবুগঞ্জ, জেলা: বরিশাল

চোখ টিপে সরে যেতে বলে

আমার বাবা ছিলো আই,ডব্লিউ,টি,এ-র চাকরিজীবী। আমরা ছিলাম এক বোন ও দুই ভাই। আমি ছিলাম বাবার বড় মেয়ে। আমার বড় ভাই হুমায়ুন কবীর এবং ছোট ভাই ছিলো শাহজাহান।

আমাদের পাশের বাড়ির এক লোককে মিলিটারিরা ধরে নিয়ে যায়। আমাদের গ্রামে অনেক দিন ধরে খারাপ অবস্থা ছিল। একদিন আমাদের বাড়িতে মিলিটারিরা আসে এবং আমার বাবার নাম জিজ্ঞাসা করে। বলি, মালেক মাঝি। জিজ্ঞাসা করে, সে কই? আমরা বলি, অফিসে গিয়েছে। তারা বলে, তার কাছে বুঝি অস্ত্র আছে? আমরা বললাম, জানি না। তারপর তারা চলে যায় এবং পরের দিন রাতে আবার আসে। তারা আমাদের বাবাকে খুঁজতে লাগলো। কিন্তু বাবাকে পেলো না, তাই আমার বড় ভাইকে ধরলো। তারা বলে, ছেলেকে নিয়ে গেলে বাবা ঠিকই থানায় আসবে।

আমার ভাইকে কয়েকজন মিলিটারি বাঁধতে বলে, আবার কয়েকজন মিলিটারি বাঁধতে বারণ করে। আমাদের ঘরে বড় একটি দেয়াল ঘড়ি এবং অনেক ভালো জিনিস ছিলো, তারা সেগুলো ঘরের বাইরে নিতে থাকে। তখন আমার মা আমার বড় ভাইকে চোখ টিপ দিয়ে সরে যেতে বলে। তখন সে ঘরের পেছন থেকে চুপ করে পালিয়ে যায়। তারা আমাদের ঘরের জিনিসপত্র নামানোর শেষে বড় ভাইকে নিয়ে যাবার জন্য ঘরে আসে। তখন তাকে না পেয়ে মিলিটারিরা

রেগে যায় এবং টর্চ লাইট দিয়ে আমার ভাইকে খুঁজতে থাকে। কিন্তু তাকে পেলো না। আমার মাকে বলে যায়, কাল দিনের মধ্যে বাবা ও ছেলে দুই জনকেই থানায় হাজির হতে বলবি। তখন পৌষ মাসের রাত। আমার ভাই সাত দিন ধরে ধান ক্ষেতে পালিয়ে থাকে। তারপর সে বাড়ি আসলো এবং শুনতে পেলো যে তারা আবার আসবে। তখন আমি ভাইকে আমার শ্বশুর বাড়ি নিয়ে আসি এবং আমরা কয়েক মাস পলাতক অবস্থায় থাকি। একদিন আমার শ্বশুর বাড়িতে মিলিটারি আসে। তখন আমি একটি ভাঙ্গা চুলার ভিতর লুকিয়ে উপরে নারিকেলের পাতা দিয়েছিলাম। তারা চলে যাবার পর আমি চুলার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসি। এভাবে কয়েক মাস কষ্ট করে থাকি। তারপর দেশ স্বাধীন হয়।

সূত্র : জ- ১৪৫০৯

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. আবুল কাশেম সুমন	**মনোয়ারা**
মাধবপাশা চন্দ্রদ্বীপ হাই স্কুল ও কলেজ	গ্রাম: মাখরকাটি
১০ম শ্রেণি, ব্যবসায় শিক্ষ শাখা, রোল: ১০	উপজেলা: বরিশাল, জেলা: বরিশাল
	সম্পর্ক: নানু

ট্রেনিং শুরু করে বাঁশের লাঠি দিয়ে

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ শুনে বাংলার দামাল ছেলেরা স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমাদের কাজির চরের অনেক দামাল ছেলেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

তখনকার মুলাদী ও হিজলার নেতা ছিলো মুক্তিযোদ্ধা মৃত মতিউর রহমান (আওয়ামী লীগ) এবং তার ভাই মিজানুর রহমান। তাদের নেতৃত্বে অনেক মুক্তিযোদ্ধা সংগঠিত হয় এবং ট্রেনিং শুরু করে বাঁশের লাঠি দিয়ে। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের আগের মঙ্গলবার হাটের দিন মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে বাজারের ছাত্র ও জনতা মিটিং শুরু করে।

মিটিংয়ের কথা শুনে তখনকার মুলাদীর দারোগা নৌকা নিয়ে বাজারে আসে এবং মিটিংয়ে বাধা দেয়। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে লাঠি দিয়ে। মিজানুর রহমানের নেতৃত্বে ছাত্ররা পুলিশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং পুলিশকে একটা ঘরের ভিতর আটকায়। বাজারের পূর্ব মাথায় খালে রাখা দারোগার নৌকা ভাঙচুর করে নয়া ভাঙ্গুলি নদীতে ভাসিয়ে দেয়। উক্ত মিছিলের সামনের অংশে নেতৃত্ব দান করেন খলিলুর রহমান, ধলু পালোয়ান, জলিল হাং, আলী আহম্মদ হাং, ফরিদ খান, কাশেম খান, হাকিম খান এবং আরো অনেক ছাত্র-জনতা। মূলত ঐ দিনই স্বাধীন হয় কাজিরচর ইউনিয়ন। এরপর মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিয়মিত চলতে থাকে। তার অনেক দিন পর মুক্তিযোদ্ধাদের একত্রে সংগঠিত করার জন্য মিজানুর রহমান, শহিদুল হাসান (চুন্নু), আমির হোসেন (লালু), শাজাহান হাং, জলিল হাং, (পাতারচর) এদেরকে নিয়ে ছবিপুর মিটিং করতে যায়। মিটিং শেষ করে যখন নন্দী বাজারে আসে তখন এদেশীয় দোসর রাজাকারের হাতে বন্দি হয় উল্লেখিত পাঁচজন।

সূত্র : জ ১৪৩৬৮

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. রাজীব হোসেন	**মো. খলিলুর রহমান**
কাজিরচর মাধ্যমিক বিদ্যালয়	
৭ম শ্রেণি, ক শাখা, রোল: ০৬	

বস্তাটি উঠালে দেখলো একটি মানুষ

আমার জানামতে আমার বাবার কাছ থেকে শুনেছি আমাদের এলাকায় কোনো পাকিস্তানি প্রবেশ করতে পারেনি। কারণ আমাদের বাড়ির পাশে একটি বড়বাড়ি ছিল। সেই বাড়ির কাজল খাঁ পাকবাহিনীকে বলেছিলেন যে, আমার এলাকায় কোনো অন্যায় অত্যাচার গোলাগুলি হবে না। তাই পাকবাহিনী কোন অত্যাচার করেনি। এই সুযোগে আমাদের এলাকায় মুক্তিবাহিনী প্রবেশ করে লুকিয়ে থাকতো। আমাদের এলাকায় একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলো কলেজের ভিপি। সে একটি কাজের জন্য আমাদের জেলা বরিশালে গিয়েছিলো। হঠাৎ পাকবাহিনী তারে বরিশাল থেকে ধরে নিয়ে যায়। তাদের শিপে তাকে নির্মমভাবে অত্যাচার করে। এ অত্যাচারে তার মৃত্যু হয়নি। তাকে একটি বস্তার ভিতরে ভরে তার বাড়ির পাশে বয়ে যাওয়া একটি নদীতে ফেলে দেয়। সে নদীটির নাম সন্ধ্যা নদী। সেই নদীতে দুই থেকে তিনদিন থাকাকালীন তার মৃত্যু হয় নি। সে আবার জীবন ফিরে পায় কয়েকটি লোকের কারণে। লোকগুলো তার জীবন ফিরিয়ে দিলো। লোকগুলো সন্ধ্যা নদীতে মাছ ধরতে যায়। হঠাৎ নদীতে জলের মধ্যে একটি বস্তা দেখে লোকে বললো, বস্তার ভিতরে কী? তারপর লোকগুলো বস্তাটি উপরে উঠালে দেখলো একটি মানুষ। লোকগুলো ধরে দেখে লোকটির প্রাণ আছে। তারপর তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলো। হাসপাতালটির নাম আমার বাবা জানেন না। সে আবার নতুন জীবন ফিরে পেলো।

আমার বাবাও তখন খুলনার একটি জুট মিলে কাজ করতো। তাদের জুট মিল বন্ধ করে দেয় পাকবাহিনী। আমার বাবা এবং আরো কয়েকজন ফুলবাড়ি জুট মিল থেকে হেঁটে এলো বরিশালে। শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ির উপর দিয়ে বরিশাল এসে পৌঁছাল। হঠাৎ একদিন খবর এলো যে, তার মিল চালু হয়েছে। তাকে যেতে বলেছে। তাই আমার বাবা আবার খুলনা গিয়েছিল কিন্তু তাদের মালিকের মিল চালু হয়নি। হয়েছিলো পাকিস্তানিদের মিল, তারা একটি মিল কিনেছিলো। এ মিলে যারা চাকরি করছিলো তাদের নির্মমভাবে হত্যা করতে দেখে আমার বাবা ফিরে এলো।

সূত্র : জ- ১৫২৪৫

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
ইমরান ফকীর	**আ. হাই হাওলাদার**
জামেনা খাতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	জেলা: বরিশাল
৭ম শ্রেণি	বয়স: ৭০, সম্পর্ক: বাবা

বস্তা ছিঁড়ে দেখে তার বাবা

যখন আমাদের দেশে যুদ্ধ হয় তখন অনেকেই সেই যুদ্ধে শহীদ হন। এমনি একটি কাহিনী হলো:

আমার মামা বাড়ি ছিলো ঘড়িসারা। ঘড়িসারায় একটি ছোট স্কুল ছিলো। আমার দাদুকে ধরে নিয়ে সেই স্কুলের ঘরটায় বন্দি করলো পাক সেনারা। আমার মা এই খবর শুনে খুবই কান্নাকাটি করেছিলো। আমার দাদুকে মা লুকিয়ে লুকিয়ে খাবার দিতো।

একদিন দাদু জানলো যে সেই রাতে তাকে পাকিস্তানি বাহিনী হত্যা করবে। স্কুলের পাশেই একটা লোক চা বিক্রি করতো। তারপর দাদা হানাদার বাহিনীকে ফাঁকি দিয়ে সেই লোকটার কাছে তার ঘড়ি, রেশমি চাদর, আরও কিছু টাকা পয়সা যা ছিলো তা দিয়ে বলেছিলো, তুমি গিয়ে আমার ছেলে ভক্তকে আমার সাথে দেখা করার জন্য বলবে। মামা দেখা করার কোনো সুযোগ পায়নি। শেষ কালে মামাকে কি বলে যেতো তা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে অনেক টাকা পয়সা অন্য লোকদের কাছে পেতো। সেই রাতে চিরদিনের মতো বিদায় নেয় দাদু।

যখন গুলি করেছিলো সেখানে ছিলো মাঝিরা। তারা গুলির শব্দ শুনতে পেলো। পরের দিন ভক্তমামা দাদুকে খুঁজতে বেরিয়ে কোনো জায়গায় খুঁজে পেলো না। মামা দাদুর জন্য কান্নাকাটি করে। এদিকে দাদুকে মেরে পানিতে ভাসিয়ে দিয়েছিলো। সারারাত পানির নিচে থেকে লাশ উপরে ভেসে উঠলো। মাঝিরা মামার এতো খোঁজাখুজি দেখে বলে, ওই নদীর তীরে একটা লোককে মেরেছিলো। বস্তা ভরে ফেলেছে। বস্তা কেটে দেখো যে তোমার বাবা কি না। তাছাড়া দাদুর চেক লুঙ্গি ও জুতা পরা ছিলো। তা অল্প অল্প দেখা যায়। তারপর মুখের কাছ থেকে বস্তা ছিঁড়ে দেখে তার বাবা। অনেক কান্নাকাটির পরেও লাশ উঠাতে পারলো না। কেননা তাহলে মামলা হবে যে, মামা মেরেছে। তারপর সেই লাশ পানিতে ভাসতে ভাসতে সখিপুর যায়। সেখানে ছিলো দাদুর বন্ধু। বন্ধু অনেক দুঃখ প্রকাশ করেছিলো।

এভাবে হত্যা করে আমার দাদুকে। আমার মা, মামাদের ছোট রেখে দাদু পরপারে চলে যায় চিরদিনের মতো।

সূত্র : জ- ১৫৫৯৮

সংগ্রহকারী:	বর্ণনাকারী:
ইতি দত্ত	**নিভা রাণী দত্ত**
বাটাজোর অশ্বিনী কুমার মাধ্যমিক বিদ্যালয়	গ্রাম: দক্ষিণ পশ্চিম পাড়া, জেলা: বরিশাল
৯ম শ্রেণি, শাখা: খ, রোল:০৭	সম্পর্ক: মা

তিনি শহীদ হন

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ। দিন গড়িয়ে সন্ধ্যা। তারপরে রাত নামলো। মানুষ সারাদিনের কাজকর্ম সেরে গভীর শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লো। ঠিক তখনই পাকিস্তানি বাহিনী বাঙালির উপর শুরু করে আক্রমণ, সহস্রাধিক মানুষ শহীদ হয়।

২৭ মার্চ শনিবার আমার পিতা স্কুলে যান। তখন তিনি নবম শ্রেণির ছাত্র। স্কুলে গিয়েই শুনতে পান ঢাকায় সংঘটিত নির্মম হত্যার কথা। অর্ধদিবসেই স্কুল ছুটি ঘোষণা করা হয় এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এক মিছিল করা হয়। এই মিছিলে ১৫০ জন ছাত্র শিকারপুর পর্যন্ত গিয়েছিলো। শিক্ষকরা স্কুলে এসে ছাত্রদের পরদিন ছোট বাঁশ নিয়ে হাজির হতে বলেন এবং পূর্বের মতো অর্ধদিবসের পরে বাঁশ নিয়ে মিছিল বের হয়। তবে তারা এ দিন বেশি দূরে যাননি। মাত্র ৩ কিলোমিটার সামনে অবস্থিত বামরাইল গিয়েছিলোন।

২৪ এপ্রিল, (৯ বৈশাখ) বুধবার শোনা যাচ্ছিলো বরিশালসহ আমাদের আশেপাশের ইউনিয়নগুলোতে প্রচুর লুটতরাজ হচ্ছে। যার ফলে ২৫ এপ্রিল বাটাজোর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নিজ বাড়িতে একটি সভার আয়োজন করেন। এখানে ইউনিয়নের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এখানে লুটতরাজ সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা হয়। বলা হয় আমাদের ইউনিয়ন বাটাজোরে কোনো লুটতরাজ হতে পারবে না। রাত ১২টায় উক্ত আলোচনা সভা শেষ হয়। পরে সকলে চলে যায়। এই সময় তিনি তার রাতের খাবার সেরে নেন। কিন্তু ঐ রাতেই কাছের এক লোকের কাছে শোনেন, পাশের বাড়িতে লুটতরাজ হচ্ছে। চেয়ারম্যান সোনামদ্দিন মিয়া তাদের বাধা দেন। যার কারণে তাকে ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয়, তিনি শহীদ হন। আর সোনামদ্দিন মিয়ার মৃত্যুতে এলাকার লুটতরাজের মাত্রা ব্যাপক বৃদ্ধি পেতে থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে একরাতে আমাদের নিজ বাড়িতেও লুট হয়।

বাটাজোর ইউনিয়নের বড় গ্রাম বাটাজোর। সেখানে ছিলো প্রায় এক হাজার লোকের বাস। পরপর এই গ্রামে তিন বার লুট হয়। এর কারণে এলাকার জনসমষ্টি মিলে মাটির নিচে একটি বিশাল সুড়ঙ্গ তৈরি করে। কিন্তু এতেও রেহাই পায়নি গ্রামের মানুষ। ১৫ মে এই সুড়ঙ্গ আক্রমণ করে পাকিস্তানি বাহিনী। আর যার কারণে একসাথে মৃত্যু হয় সুড়ঙ্গের ১৩৫ জন নারী পুরুষের। লুটতরাজের মাত্রা চরমে উঠলে এলাকার কিছু ডাকাত ধরা পড়ে। যার মধ্যে প্রধান ছিল তুজম্বর, জব্বার, আক্কাস। এদের ধামুরা ব্রিজের কাছে নিয়ে হত্যা করা হয়।

১৩ ডিসেম্বর বাটাজোর ইউনিয়নের জন্য একটি বেদনার রাত। এই রাতে গ্রামের মেরুদণ্ড তিন জন প্রফেসরকে ধরে নেওয়া হয়। পরে ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালের সন্ধ্যায় তাদের হত্যা করা হয়।

সূত্র : জ- ১৫৬১০

সংগ্রহকারী:	বর্ণনাকারী:
এস.এম. সিফাত	**নান্না সরদার**
বাটাজোর অশ্বিনী কুমার মাধ্যমিক বিদ্যালয়	জেলা: বরিশাল
নবম শ্রেণি, শাখা: খ, রোল: ০৩	বয়স: ৫৪, সম্পর্ক: বাবা

গ্রামের নাম খেয়াঘাট

আমাদের গ্রামের নাম খেয়াঘাট। আমাদের গ্রামের এবং আশেপাশের অনেক মানুষকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নির্মমভাবে হত্যা ও নির্যাতন করেছে। তাদের মধ্যে আছে আমার চাচারা। আমার মায়ের মতন শ্রদ্ধেয়া আমার গ্রামের চাচী। আমার গ্রামের চাচারা, যাদের

নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে তাদের নাম হলো কৃষ্ণ ঠাকুর, কালু ঠাকুর, বলাই ঠাকুর, মানিক ঠাকুর ও নারায়ণ ঠাকুর। তারা এই পাঁচ জন ছিলেন ভাই ভাই। তারা খুব ভালো মানুষ ছিলেন। কিন্তু এক রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের বাড়িতে এসে চারপাশে ঘেরাও করে। দু'জন মিলিটারি তাদেরকে খেয়াল করলো। তারা মিলিটারিদের দেখে পালানোর চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না। সেই রাতে মিলিটারিরা তাদের পাঁচজনকে এক রশিতে একই সাথে বেঁধে নিয়ে বাটাজোর ব্রিজের উপরে নির্মমভাবে হত্যা করে। তার পরের দিন রাতে বলাই ঠাকুরের স্ত্রী আলো ঠাকুরাণীকে ঘর থেকে চুল ধরে বের করে আনে। পাকিস্তানি বাহিনী তাকে নির্যাতন করতে চাইলে তিনি দৌড়াতে দৌড়াতে ধান গাছের নিচে পালান ইজ্জত বাঁচানোর জন্য কিন্তু পারলেন না। কয়েকজন মিলিটারি তার ইজ্জত ছিনিয়ে নেয়। তারপর তিনি পাগল অবস্থায় ঘুরতে লাগলেন। পরিশেষে জ্বালা-কষ্ট সইতে না পেরে এবং তার স্বামীকে না পেয়ে ভারতে চলে যান। তিনি এখনো ভারতে আছেন।

সূত্র : জ- ১৫৬১৩

সংগ্রহকারী:	বর্ণনাকারী:
মনিকা আক্তার	**দিলু বেগম**
বাটাজোর অশ্বিনী কুমার মাধ্যমিক বিদ্যালয়	জেলা: বরিশাল
৭ম শ্রেণি, রোল:১৬	বয়স: ৬০, সম্পর্ক: বড় কাকি

ভাল খবর

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সেপ্টেম্বর/অক্টোবর মাসের দিকে মেহেন্দিগঞ্জ থানা অঞ্চলে মুক্তিযোদ্ধাদের কমান্ডার ছিলেন আমার বাবার এক মামা। মেহেন্দিগঞ্জ থানাকে রাজাকারমুক্ত করার জন্য মাঝে মাঝে রাত্রে মুক্তিযোদ্ধারা থানায় আক্রমণ করতে আসার পূর্বেই লোক মাধ্যমে তথ্যটি আমার দাদাকে জানিয়ে দিতেন। কারণ রাত্রে গোলাগুলি শুরু হলে যাতে বাসার সকলে ভীত-আতঙ্কিত না হয়। থানা থেকে আমার দাদার বাসার দূরত্ব ছিল অনুমান পাঁচশ গজ। ১৯৭১ সালের রমজান মাসের শেষের দিকে সম্ভবত ইংরেজি নভেম্বরের শেষে মুক্তিযোদ্ধারা মেহেন্দিগঞ্জ থানা রাজাকারমুক্ত করার জন্য চতুর্দিক থেকে ঘিরে সাঁড়াশি আক্রমণ পরিচালনা করে। আক্রমণের দিন সন্ধ্যারাতেই সংবাদ পেয়ে দাদা, দাদু, বাবা, ফুপিসহ সকলকে গোলাগুলি শুনলে আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য বলেন। সেহেরির সময়ের শেষের দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ শুরু হলে দাদা ঘরের সবাইকে নিয়ে খাট থেকে নেমে মাটিতে শুয়ে পড়েন। ভোর হওয়ার পর বাসার চতুর্দিকে মুক্তিযোদ্ধাদের ব্যাপক পদচারণার ফলে ঘর থেকে দাদা, বাবা বের হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মুখে শুনতে পান ভাল খবর।

দাদার বাসার পূর্ব পাশের বাসার মালিক পাকিস্তানিদের দালাল শান্তি কমিটির নেতা বজলাল করিম বেপারীর দুই পুত্র ঘৃণ্য রাজাকার রতন বেপারী ও নান্নু বেপারী। রুকুন্দি গ্রামের আ: হক মাস্টারকে বাংকারে পেয়ে মুক্তিযোদ্ধারা হত্যা করেছে। তাদের কতকের পা কুকুরে খাচ্ছে এবং দাদা, বাবা ও অন্যরা গিয়ে এ ঘটনা স্বচক্ষে দেখেন।

মেহেন্দিগঞ্জ থানাটিকে রাজাকাররা একটি দুর্ভেদ্য ক্যাম্প হিসেবে গড়ে তুলেছিল। থানাটির দুইদিকে খাল। পূর্ব দিকে নিকটবর্তী পাতারহাট মুসলিম হাই স্কুল। থানা থেকে সুড়ঙ্গ পথের রাস্তা করে উক্ত স্কুলে যাতায়াত করতো রাজাকাররা। তারা স্কুলের দোতলা ও ছাদে ক্যাম্প করে দক্ষিণ পূর্ব ও উত্তর দিকে অনেক দূর পর্যন্ত দেখত ও নিয়ন্ত্রণ করত। থানার পশ্চিমে জনতা ব্যাংকের দোতলা ভবনের উপরেও রাজাকারদের অনেক শক্ত ক্যাম্প ছিল। এর চতুর্দিকে ব্যবসায়ীদের দোকান ঘর থাকায় মুক্তিযোদ্ধারা বিশেষ করে রাতের আঁধারে দোকানের গা ঘেঁষে ব্যাংক ভবনে রাজাকারদের উপর প্রায় সপ্তাহকাল আক্রমণ করে তাদের পতন ঘটিয়ে চূড়ান্তভাবে থানা আক্রমণের পরিস্থিতি সৃষ্টি করলে রাজাকাররা তা বুঝতে পারে। তারা ভবনের নিকটবর্তী দোকান ঘরে আগুন লাগিয়ে পাতারহাট বন্দরের সকল ব্যবসায়ীর দোকান পুড়িয়ে ফেলে। তারপরও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রাণপণ আক্রমণ চলতে থাকে।

দাদুর বাসার দক্ষিণে খালের অপর পাড়ে বেপারী বাড়িতে পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের ভাত রান্না ও খাবার আয়োজনের ব্যবস্থা ছিল। পশ্চিম দিকে থাকা মুক্তিযোদ্ধারা বিরতি ও বিশ্রামকালীন দাদার বাসায় এবং পার্শ্ববর্তী গান্ধী বাবুর মাঠে অবস্থান করতেন। দাদার বাসায় তাদের রাখা হত এবং সেখানে তারা খেতেন। ওই সময় বরিশাল থেকে পাকবাহিনী মেহেন্দীগঞ্জ আসছে এরকম গুজব চলাকালীন এক দুপুরবেলা কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাসহ দাদা গান্ধী বাবুর মাঠ সংলগ্ন পুকুরের এক প্রান্তে উঁচু পাড়ে বসে ধান ক্ষেতের শেষে দূরবর্তী রাস্তার দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলেন। প্রথমে দাদা দেখতে পান যে, রাস্তা থেকে অস্ত্রের মত কিছু হাতে নিয়ে লাইন দিয়ে কিছু লোক ধানক্ষেতের মধ্যে নেমে নিচু হয়ে তাদের দিকেই আসছে। আর তারা সম্ভবত পাকিস্তানি লোক। উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধারা প্রথমে এটা বিশ্বাস করতে না চাইলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা নিশ্চিত হন আসলেই বরিশাল থেকে আসা পাকবাহিনী এগিয়ে আসছে। মুহূর্তের মধ্যেই সব জায়গায় সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। আত্মরক্ষার জন্য মুক্তিযোদ্ধা ও সহযোগীরা উত্তর পূর্ব দিকে নিরাপদ স্থানে চলে যেতে থাকেন। দাদা ঘরের সবাইকে আল্লাহর নাম নিয়ে ঘরে বসে থাকতে বলে নিরাপদ স্থানের দিকে চলে যান। দাদার ঘরের মিটসেফের মধ্যে গামলা ভর্তি ভাত, গরুর মাংস, বালতি ভর্তি পানি এবং আলমারির ওপর মুক্তিযোদ্ধাদের ওষুধ ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের দুপুরের খাবার সেদিন খাওয়া হয়নি। কালো পোশাক পরিহিত আলবদর বাহিনীসহ পাকসেনারা দাদার বসতঘরের দরজায় এসে খোলা জানালা দিয়ে বেয়নেটসহ চাইনিজ রাইফেলের নল ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা খোলার জন্য হুংকার দিতে থাকে। ৪/৫ টি পরিবারের সদস্যরা ঘরের মধ্যে শুয়ে-বসে ছিলেন। যার মধ্যে বাবাও ছিলেন। তিনি তখন দশম শ্রেণির ছাত্র। দাদার বাসায় তিনটি ঘর তিনজন পুলিশ সপরিবারে ভাড়া নিয়ে থাকতেন। পাকবাহিনী আসছে দেখে আত্মরক্ষার জন্য উপস্থিত বুদ্ধি করে পুলিশ পরিবারের সদস্যরা তাদের ঘরে থাকা পুলিশের পোশাক এবং পোশাক পরিহিত পুলিশের ছবি নিয়ে এক পুলিশের স্ত্রী সাহস করে দাদার ঘরের দরজা খুলে দিলে ৪/৫ জন পাকসেনা ও আলবদর সদস্য ঘরে ঢুকে তন্ন তন্ন করে মুক্তিযোদ্ধা আছে কিনা খুঁজতে থাকে। একজন পাকসেনা ইশারায় বুঝিয়ে খাবার পানি চাইলে ঘরের কেউ পানি দিতে পারছিলেন না। কারণ গ্লাসের জন্য মিটসেফ খুললে প্রচুর ভাত, ডাল, মাংস দেখলে শত্রুরা বুঝে ফেলবে এঘরে মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থান ছিল। তখন সবাইকে মেরে ফেলবে। পুলিশ পরিবারের সদস্যরা পোশাক ছবি দেখিয়ে বারবার বুঝানোর চেষ্টা করে এখানে থাকা সবাই পুলিশ পরিবারের। কেউ শত্রু না। এদিকে খাবার পানি না দেয়ায় এক

পাকসেনা এক পুলিশের স্ত্রীর গালে চড় মারে। সৌভাগ্যক্রমে আলমারির ওপরে থাকা ওষুধের ওপর চোখ পড়েনি তাদের। এক পর্যায়ে পাকিস্তানিদের সঙ্গী আলবদররা বিশ্বাস করে সকলেই পুলিশ পরিবারের লোক এবং পাকসেনাদের বুঝিয়ে নিয়ে গেল। সে যাত্রায় ঘরে থাকা সকলেই প্রাণে বেঁচে যায় যা ছিল অকল্পনীয়।

এরপর পাক সেনারা থানায় গিয়ে রাজাকার দালালদের নিয়ে বিভিন্ন স্থানে অগ্নিসংযোগ ও নিরীহ মানুষ হত্যা শুরু করে। নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিয়ে দাদা সকলকে চিন্তা না করার সংবাদ পাঠান। পরবর্তীতে স্থানীয় রাজাকার ও দালালরা মুক্তিযোদ্ধাদের দাদার বাসায় খাওয়া, অবস্থান, বিশ্রামের সংবাদ জেনে যায়। তারা দাদাকে ধরবে সুযোগ খুঁজতে থাকে। কিন্তু দাদার বাসার ভাড়াটিয়া তিনজন পুলিশ বাধ্য হয়ে চাকরি করলেও তাদের পরিবারের সদস্যদের সম্মানজনকভাবে বসবাসের ব্যবস্থা নিশ্চিত করায় সর্বদা রাজাকারদের হাত থেকে দাদাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালাতে থাকে।

৭১ সালের ডিসেম্বর মাসের সম্ভবত ১০ তারিখের পর একদিন দুপুর বেলা হঠাৎ করে ১০/১২ জন রাজাকার এসে কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে দাদাকে থানায় ধরে নিয়ে যায়। বাসার সবাই কান্নাকাটি করতে থাকেন। সংবাদ পেয়ে দাদার বাসার ভাড়াটিয়া তিন পুলিশ থানায় রাজাকারদের মুখোমুখি হয়ে দাদাকে ধরে নেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে উভয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ বাকবিতণ্ডা হয়। থানার দ্বিতীয় কর্মকর্তা তখন দাদাকে রাজাকারদের নিয়ন্ত্রণ থেকে পুলিশের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে রাখেন। কয়েকজন রাজাকার বিভিন্নভাবে চেষ্টা করেন দাদাকে পাশের মুসলিম হাই স্কুলের রাজাকার ক্যাম্পে নিয়ে হত্যা করার। টের পেয়ে ওই পুলিশরা জানিয়ে দেয় তাদেরকে হত্যা না করে রাজাকারেরা দাদাকে রাজাকার ক্যাম্পে নিতে পারবে না। এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে কিছুটা উত্তেজনা হয়। দাদার জীবনের নিরাপত্তার জন্য ওই তিন পুলিশ দিনরাত পাহারা দিত। সম্ভবত ১২ ডিসেম্বর মেহেন্দিগঞ্জ থানাকে হানাদারমুক্ত করার জন্য মুক্তিবাহিনী চূড়ান্ত আক্রমণ করে। রাজাকাররা দাদাকে থানায় ধরে নিয়ে গেছে এখবরও তাদের জানানো হয়।

তীব্র যুদ্ধ চলতে থাকলে এক পর্যায়ে নিরাপত্তার স্বার্থেই দাদু বাবাসহ সবাইকে নিয়ে গ্রামের বাড়ি চলে যান। ইতিমধ্যে বরিশাল ও আশেপাশের সকল এলাকা হানাদারমুক্ত হয়। ১৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনী মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হলেও মেহেন্দিগঞ্জ থানায় দুর্ভেদ্য দুর্গে থাকা রাজাকাররা আত্মসমর্পণ না করে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। সারা দেশের পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা আত্মসমর্পণ করেছে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে একথা তারা কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। যুদ্ধ করতেই থাকে। অবশেষে ১৭ বা ১৮ ডিসেম্বর থানার মেজ দারোগার বরিশালে থাকা স্ত্রী ও বরিশাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে স্পিড বোটে মেহেন্দিগঞ্জ থানায় এনে তাদের দ্বারা বুঝিয়ে রাজাকারদের বিশ্বাস করাতে হয় যে, পাকিস্তানিরা পরাজিত হয়েছে। এরপর থানার মেজ দারোগা ও রাজাকাররা আত্মসমর্পণে রাজি হয়। তারপরই মুক্তিযোদ্ধাদের নির্দেশে রাজাকাররা দাদাকে থানা থেকে নারকেল গাছের ডগায় সাদা কাপড়ের টুকরো বেঁধে শান্তির পতাকা ধরিয়ে মুক্তি দিলে তিনি মৃত্যুকুপে প্রায় ৮ দিন থাকার পর নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন। ১৯ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধারা মেহেন্দিগঞ্জ থানাকে রাজাকারমুক্ত করে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন।

সংগ্রহকারী
কাশফিয়া মাহাবুব মাইশা
বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
শ্রেণি-৯ম, ক রোল নং- ০৬

বর্ণনাকারী
মোঃ আবদুল হাই মাহাবুব
বয়স: ৫৪ বছর
সম্পর্ক: বাবা

স্কুল ছুটি দেন

বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব বাঙালি জাতির জন্য বড় অর্জন। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বিশাল জনসভায় জাতির পিতা অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। আমরাও রেডিওতে খবর শুনেছিলাম। আর একটু আনন্দে, সেই সাথে ভয়ে কাঁপতে থাকি। কি হবে এদেশের মানুষের অবস্থা! আমার বাবার বাড়ি বরিশাল জেলা সদর বগুড়া রোডে। বাবা-মা, ভাই-বোন, চাচা-মামা মিলে মোট ১৪ জন বসবাস করতাম। বাবা বললেন, ঘরের বাইরে বের হবে না। এ দেশের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

বাবা বরিশাল জর্জ কোর্টে চাকরি করতেন। আর মা ছিলেন গৃহিনী। চুপি চুপি রেডিওতে শব্দ কমিয়ে খবর শুনতাম। রাত হলে হেরিকেনের চারদিকে কাগজ দিয়ে মুড়ে অল্প আলোতে থাকতাম। ২৫ মার্চ রাতে হঠাৎ আকাশ পথে বেশ শব্দ হচ্ছিল। পাশের বাসার মামা, খালা ও আমার বাবা-মা মিলে রাতের আঁধারে বাইরে দাঁড়িয়ে শব্দ শুনছিলেন। আমরা শব্দ শুনে ঘুম থেকে সজাগ হয়ে দৌড়ে বাইরে বের হই। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি ছোট লালবাতি জ্বলছে আর শব্দ করছে। বেশ কিছুক্ষণ পর শব্দ থেমে যায়। ভয়ে আমরা বাবা-মাকে ধরে কাঁদতে থাকি। তারা আমাদের সান্ত্বনা দেন এবং ঘুমোনোর জন্য ঘরে নিয়ে যান। সকাল বেলা শুনতে পেলাম অনেক খবর। ঢাকা থেকে শুরু হল মুক্তিযুদ্ধ। আস্তে আস্তে সব জায়গায় পাকিস্তানি সেনারা দখল নিয়ে ক্যাম্প গড়ছে। বরিশালে ওয়াপদা কলোনিতে ক্যাম্প গড়েছে।

আমি তখন ৮ম শ্রেণির ছাত্রী। আমি বরিশাল সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়ি। আমরা তিন বোন দুই ভাই। আমরা তিন বোন একই স্কুলে পড়তাম। আর ভাইরা বিএম স্কুলের ছাত্র। রাতের আঁধারে আমাদের এলাকার ঝন্টু কাকাকে পাকিস্তানিরা ক্যাম্পে নিয়ে যায়। যাবার সময় কাকা জোরে জোরে কেঁদে বলেছিলেন, কে কোথায় আছো বাঁচাও বাঁচাও। কিন্তু সশস্ত্র সেনাবাহিনীর গাড়ির সম্মুখে কে যাবে? ভয়ে নিঃশব্দে সবাই কাঁদছিলাম। কাকা আর ফিরে আসে নাই। কারণ তিনি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। তাকে রাজাকাররা ধরিয়ে দিয়েছে।

বাবা সকালে মাকে বললেন, শহরের অবস্থা খুবই খারাপ। তোমরা গ্রামের বাড়িতে গিয়ে থাক। বাবা সবাইকে নিয়ে নাজিরের পোলের কাছে নৌকা করে বানারীপাড়ার উদয়কাঠী গ্রামে নিয়ে যান। আমরা সবাই ভাত, তরকারি রান্না করে, হাড়িতে বসিয়ে ভাই-বোন, বাবা-মাসহ এক নৌকায় রওয়ানা হই। কিন্তু সেখানেও নিস্তার নেই। মিলিটারিরা গানবোট নিয়ে এ গ্রাম ও গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে। আমরা কখনও সবুজ রংয়ের কাপড় পড়ে জঙ্গলে খাল পাড়ে লুকিয়ে থেকেছি। আমি মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে বিজয় ছিনিয়ে আনার প্রতিজ্ঞা শুনেছি। আমার বড় মামা,

কাকা এরা সবাই মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছেন। যাবার সময় মা, নানি, কাকিরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তারা যুদ্ধে গিয়ে মাঝে মাঝে চিঠি দিয়ে যোগাযোগ করেছিলেন। মাও আমাকে দিয়ে তাদের কাছে চিঠি লেখাতেন। গ্রামে মিলিটারি বাহিনী রাজাকারদের কাছে শুনতে পায় আমাদের বাড়ি থেকে অনেক যুবক যুদ্ধে গেছে। বাবা আমাদের নিরাপত্তার জন্য আবার শহরে নিয়ে আসেন। কারণ আমাদের উপর মিলিটারিরা আক্রমণ করতে পারে।

মুক্তিযোদ্ধারা প্রায়ই আমাদের এলাকায় আসতেন রাতের আঁধারে। বাবার সঙ্গে কথা হত। দেখতাম বাবা ফিস ফিস করে কি যেন বলতেন। আমাদের বাসার পশ্চিম পাশের ওয়ার্কশপে মিলিটারি সেনারা গাড়ি সারাতে আসত। আমরা নিশ্চুপ হয়ে থাকতাম। বরিশালে প্রথম বোমা নিক্ষেপ হয় রহমতপুর এবং বরিশালের শিপ ডকে। তখন আমরা বাংকারে লুকিয়ে থাকি। আমাদের বাসার পেছনের খালি জায়গায় বাবা-চাচারা বাঙ্কার বানায়। মাটির সুড়ঙ্গের নিচে খাটের মতো কাঠ বিছিয়ে দেই। এবং উপরেও কাঠ বিছানো থাকে। কাঠের উপর ডালপাতা ছড়ানো ছিটানো থাকে। আমার মেঝ আপা টাইফয়েড জ্বরে ভুগছিলো। বোমার বিকট শব্দে তাকে ভুলে ঘরে রেখে আমরা সবাই দৌড়ে বাংকারে লুকাই। মেঝ আপার চিৎকারে বড় আপা তাকে দৌড়ে গিয়ে বাংকারে নিয়ে আসে। তখন সবাই মিলে কেঁদে ফেলি। আমাদের বুঝি রক্ষা নেই। মিলিটারিরা টহল দিচ্ছে। ভয়ে বুক ধুকধুক করছে। কখন বুঝি সবাই মরে যাই।

কোথাও পালিয়ে না গিয়ে স্বাধীনতার আশায় থাকি। আমাদের বাসার ছাদে লতা-পাতা, ডাল কেটে স্তুপ করে বাবা রেখেছিলেন যেন হেলিকপ্টার থেকে বাড়ি ঘর না বুঝায়। দিন রাত কারফিউ লেগেই থাকে। রাতের আঁধারে, দিনের আলোতে মোমবাতি জ্বালিয়ে থাকতাম।

নভেম্বর মাসে আমাদের স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা আরম্ভ হয়। শুধু আমাদের না, সব স্কুলেই বার্ষিক পরীক্ষা আরম্ভ হয়। সব ভাই বোন মিলে পরীক্ষা দিতে যাই। হঠাৎ শোনা গেলো বিকট শব্দ। কোথায়ও যেন বোমা নিক্ষেপ করেছে। আমরা সব ছাত্রীরা চিৎকার ও কান্নাকাটি শুরু করি। আমাদের বড় আপা ছিলেন মোস্তারি আপা। তিনি খুব রাগী প্রকৃতির, মেয়েদের বকা দেন। সবাই পরীক্ষা দেওয়া শুরু করল। হঠাৎ আবারও বোমার আওয়াজ। মন্ত্রণালয় থেকে প্রধান শিক্ষিকাকে ফোন করা হয় স্কুল ছুটি দিতে। 'স্কুল ছুটি দেন, এক ঘন্টা পর কারফিউ হবে।' শুধু স্কুল নয় সমস্ত অফিস আদালত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সব বন্ধ। সবাই যার যার বাড়ির দিকে ছুটছে। রাস্তায় হাজার হাজার লোক। নদীর স্রোতের মতো। সবাই প্রাণ রক্ষায় দৌড়াচ্ছে। আমরা তিন বোন কাঁদছিলাম আর চোখ মুছছিলাম। দৌড় দেবার মতো রাস্তায় জায়গা নেই। তিন বোন হাত শক্ত করে ধরে বাসায় ফিরলাম। এদিকে মা কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন। ঘরের সবাই যার যার কাজে বাইরে গিয়েছে। কীভাবে তারা আসবে! মা গেটের কাছে অশ্রুভেজা চোখে আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে রইলেন। প্রথমে আমরা তিন বোন, পরে ভাইরা একে একে সবাই ঘরে ফিরলাম। বাবা আমাদের নিয়ে চুপ করে ঘরের মধ্যে বসে রইলেন। কারফিউ শুরু হয়ে গেল।

হঠাৎ করে রেডিওতে শোনা গেল সেনাবাহিনীকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধারা সব জায়গা দখল করে নিচ্ছে। বরিশাল থেকে সেনাবাহিনী কারফিউ দিয়ে চলে যায়। কিন্তু তালতলীতে তাদের লঞ্চ মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ করে ডুবিয়ে দেয়। সন্ধ্যায় মুক্তিযোদ্ধারা 'জয় বাংলা' বলতে বলতে শহরে উঠে আসে। কিছু দিন পরে আমাদের বাসায় আমার বড় মামা, কাকা ফিরে আসেন। বাবা-মাকে সালাম করেন এবং জড়িয়ে ধরে কান্না করতে থাকেন। তাদের

কান্না দেখে আমরাও কাঁদতে থাকি। ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে ফিরে পেয়েছি আমরা আমাদের স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ।

এই কথাগুলো বলতে বলতে মার চোখ থেকে অঝোরে অশ্রু ঝরতে থাকে। আমার মা স্বাধীনতার দিনগুলো আমাদের বলেছেন, সেই গল্প সেই ইতিহাস আমার চিরদিন মনে থাকবে।

সূত্র : জ ১৪১৪৮

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
সিফাত-ই-তানজিলা সুপ্তি	**মমতাজ বেগম**
বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	বয়স: ৪২ বছর
শ্রেণি -৮ম খ, রোল নং-	সম্পর্ক- মা

গায়ের উপর সাত আটটি লাশ

স্বাধীনতা অর্জন করতে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করতে হয়েছিল অনেক দেশপ্রেমিককে। যারা মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে পরিচিত। এদের মধ্যে কেউ কেউ প্রাণ দিয়েছেন, আবার কেউ কেউ এখনও বেঁচে রয়েছেন আমাদের মাঝে। তাদের মধ্যে একজন মুক্তিযোদ্ধার কথা আমি এ লেখায় তুলে ধরব। তিনি হলেন আমার নানাভাই। তার নাম আবদুল মতিন শিকদার। তার বয়স ৭৫ বছর। তিনি ছিলেন পুলিশ কনস্টেবেল। তিনি ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় কুমিল্লা পুলিশ লাইনে কর্মরত ছিলেন।

প্রথম যে রাতে হানাদার বাহিনী পুলিশ লাইন ঘেরাও করে ঠিক ওই মুহূর্তে আমার নানাভাইয়ের প্রথম গেটে ডিউটি ছিল। হানাদার বাহিনী চারদিক থেকে এক সঙ্গে গুলি ছুঁড়তে শুরু করল। তখন নানাভাইও গুলি করছিল। এক পর্যায়ে নানাভাই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সেই অবস্থায় মাটিতে গড়িয়ে গড়িয়ে পুলিশ হাসপাতালে ঢুকে সেখানে তিনি অজ্ঞান অবস্থায় পড়েছিলেন। যারা মারা যায় হানাদার বাহিনী তাদের গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে যায়। যখন গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে যায় তখন প্রথমেই আমার নানাভাইকে উঠায় এবং তার গায়ের উপর আরো সাত আটটি লাশ রাখে। তারপর গাড়িতে তাদের কুমিলা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। সদর হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তার যখন দেখেন যে নানাভাই জীবিত আছেন তখন তিনি নানাভাইয়ের চিকিৎসা করে তাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন।

সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে আবার তিনি যুদ্ধ করেন। তখন পথিমধ্যে রাজাকারদের সহযোগিতায় হানাদার বাহিনী নানাভাইকে ধরে নিয়ে যায়। যাওয়ার সময় নানাভাই তার মায়ের কাছে একটি চিঠি লিখেছিল যে, "মা আমি হানাদার বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছি। জানিনা আর ফিরে আসব কিনা।" ধরে নিয়ে যাওয়ার পরে অনেক অত্যাচার করেছে হানাদার বাহিনী। সেখানে যে রুমে তাদের আটক রেখেছিল সেই রুমে আরো তিন-চারশ বাঙালি ছিল। মাথার কাছে একটি বাঁশে তাদের হাত ও পায়ের কাছে একটি বাঁশের সাথে পা বেঁধে অনেক মারধর করেছে। এমতাবস্থায় ছিল দুই তিন মাস। বাঁধা অবস্থায় থাকতে থাকতে তাদের হাতের কব্জায় পচন ধরেছিল। চোখ বেঁধে রাখায় চোখ ফুলে গিয়েছিল। এভাবে আরো নানা ধরনের অত্যাচার

করেছিল। অবশেষে একদিন অতিষ্ঠ হয়ে তারা সবাই মিলে দোয়া ইউনুস পড়েছিল এবং মোনাজাতে আল্লাহর কাছে অনেক কান্নাকাটি করেছিল।

এভাবে দীর্ঘদিন পরে বিজয় ঘোষণার সময় তিনি ছিলেন কারাগারে। এরপরে তারা মুক্তি পান। এদিকে তার মা, বোন-ভাই ও আত্মীয়-স্বজনরা কেউ জানত না তিনি বেঁচে আছেন। যেদিন তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান সেদিনই মায়ের সাথে দেখা করার জন্য কুমিল্লা থেকে বরিশালের উদ্দেশে রওয়ানা হন। রাত তিনটায় তিনি বাড়িতে এসে পৌঁছান। ঐ রাতে তিনি বাড়ি এসে শোনেন, মা না ঘুমিয়ে নামাজে বসে আল্লাহর কাছে তার ছেলের প্রাণভিক্ষার জন্য অনেক কান্নাকাটি করছেন। অবশেষে যখন মাকে ডাক দিলেন তখন মা এসে দরজা খুলে অন্ধকারের মধ্যে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। সেই রাতে নানাভাইকে এক নজর দেখার জন্য ভিড় জমায় অনেক লোক। তখন তারা আনন্দে আত্মহারা হয়েছিল যে এত কিছুর পরও তিনি বেঁচে আছেন।

তার বর্তমান বয়স ৭৫ বছর। আমরা দোয়া করি যেন আল্লাহ তাকে আরও দীর্ঘজীবী করেন। আর তাদের সাহসিকতার জের ধরে আমরাও বাংলাদেশকে সুন্দর করতে প্রতিজ্ঞা করব।

সূত্র : জ ১৪১৫৮

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
সুমাইয়া ইসলাম	**আবদুল মতিন শিকদার**
বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	বয়স: ৭৫ বছর
শ্রেণি-৬ষ্ঠ রোল নং-	

শতাধিক রাজাকার ধৃত হয়

১৯৭১ সালের আগস্ট মাস। পানিতে সারাদেশ থৈ থৈ। পাকিস্তানি সেনা গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া থানার বিভিন্ন গ্রামে প্রবেশ করে বাঙালি ধরে ধরে রাস্তায় লাইন দিয়ে গুলি করে হত্যা করে। তারই মধ্যে আমার বাবার বন্ধু লিয়াকতের পিতা ঘাঘর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সুরাত আলী মিয়াকে গুলি করে এবং বেয়নেট দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে তার মৃত্যু নিশ্চিত করে। ঐ সময় তার ইউনিয়ন বান্ধাবাড়ি মিলিটারি প্রবেশ করে হত্যাযজ্ঞ চালায়। সংবাদ পেয়ে আমার পিতা মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। শত শত মানুষের লাশ ধানের ক্ষেতের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেন।

একদিন তাদের দলনেতা মেজর হেমায়েত উদ্দিনের নেতৃত্বে রামশীল নামক গ্রামে প্রবেশ করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সংবাদ পেয়ে কোটালীপাড়া থেকে দুটি গানবোট ভর্তি করে পাকিস্তানি আর্মি ও তাদের দোসর কোটালীপাড়া রাজাকার বাহিনী বাচাড়ি নৌকা করে রামশীল গ্রামে প্রবেশ করে। ঐ সময় মেজর হেমায়েত উদ্দিনের নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা রামশীল নদীর দুই পাড়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। দক্ষিণ দিকে থেকে মিলিটারির গানবোট ও রাজাকার বাহিনীর বাচাড়ি রামশীলের মধ্যে প্রবেশ করলে হেমায়েতের নির্দেশে দুপাড় থেকে মিলিটারিদের উপর ফায়ার শুরু হয়। তখন মিলিটারিরা দিশেহারা হয়ে গানবোট নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর না হয়ে পিছু

হটতে বাধ্য হয়। ঐ যুদ্ধে মেজর হেমায়েত মুখে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন। শতাধিক রাজাকার মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ধৃত হয়।

আমাদের গ্রামের মধ্যে খাল দিয়ে শত শত নারীপুরুষের লাশ ভেসে যেতে দেখেছেন। ১৯৭১ সালের ১৫ ডিসেম্বর আমার পিতা কোটালীপাড়া থেকে টাবুরে নৌকায় করে গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কোটালীপাড়া থানা রাতের অন্ধকারে দখল করেন। সকালে ১৬ ডিসেম্বর বান্ধাবাড়ি তার নিজগ্রামে এস পৌঁছালে রেডিওতে ঘোষণা শোনেন পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে। সাথে সাথে তিনি শত শত গ্রামের লোকের সাথে কোটালীপাড়া পৌঁছান এবং মুক্তিযোদ্ধারা একত্রিত হয়ে কোটালীপাড়া কলেজ মাঠে বিজয় মিছিল করেন।

সূত্র : জ ১৪৮৮৭

সংগ্রহকারী:	বর্ণনাকারী:
শেখ ফয়সাল কাদের	**শেখ আব্দুল কাদের**
বরিশাল জিলা স্কুল	জেলা: বরিশাল
৮ম শ্রেণি, রোল: ০৮	সম্পর্ক: বাবা

কিছু বুঝে ওঠার আগেই

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বাঙালির গৌরবের ইতিহাস। মহান মুক্তিযুদ্ধ দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি। শুধু এ সম্পর্কে টিভি ও পত্র-পত্রিকায় জেনেছি। মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সেদিন প্রথম আলোড়িত হয়েছি, যেদিন মুক্তিযুদ্ধের ভ্রাম্যমাণ জাদুঘরটি আমাদের স্কুলে এলো। দেখেছি আর ভেবেছি কতো ত্যাগ আর কষ্টের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি মহান স্বাধীনতা।

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বর্ণনাকারী হিসেবে এখানে আমি আমার নানুর অভিজ্ঞতা তুলে ধরছি। আমাদের বাড়ি ছিলো ঝালকাঠি জেলার বীরকাঠি গ্রামে। আমার বাবা পুলিশে চাকরি করতেন। বাবা যে থানায় চাকরি করতেন সেই থানা মিলিটারিরা লুট করে বাবাকে বন্দি করে নিয়ে যান। একমাত্র ছেলের শোকে আমার দাদি ছিলেন বাকরুদ্ধ। ছয় বোন এক ভাইকে নিয়ে আমার মা দিশেহারা। সবার মধ্যে আমি ছিলাম বড়, দেখতে ছিলাম অনেক সুন্দরী। তাই আমাকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি উৎকণ্ঠা। প্রতিটি মুহূর্ত কাটছিলো আতঙ্কে আর অনিশ্চয়তার মধ্যে। একদিন এক শীতের সকালে আমরা ঘর-গৃহস্থালির কাজে ব্যস্ত ছিলাম। এমন সময় খবর এলো গ্রামে মিলিটারি ঢুকেছে। আমাদের গ্রামের পূর্ব দিকে ছিলো মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প। মিলিটারিরা আক্রমণ করে পশ্চিম দিক থেকে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমাদের বাড়িতে মিলিটারি ঢুকে পড়লো। আমরা ক'বোন ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে পেছনের দরজা দিয়ে পালানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু মিলিটারিরা পেছন দিক থেকে ঢুকে খপ করে আমার হাত ধরে ফেললো। আমার বয়স তখন ১৫/১৬ বছর হবে। ভয়ে আমার শরীর শিউরে উঠলো। যত দোয়া দরুদ ছিলো সব উচ্চস্বরে পড়তে লাগলাম। সমস্ত শরীর ভয়ে শক্ত হয়ে গেলো। আমার দোয়া দরুদ পড়া শুনে

তাদের একজন উর্দুতে বললো- 'সাচ্চা মুসলমান, ছেড়ে দাও।' আল্লাহর অশেষ রহমতে কি বুঝে তারা আমাকে ছেড়ে দিলো। মনে হয় আমি জ্ঞান হারালাম।

পরে ওরা মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প কোথায় জানতে চাইলো। কে একজন বিপরীত দিকের একটি রাস্তা দেখিয়ে দিলো। কোনো রকম প্রাণে বেঁচে ঐ দিনই আমরা পাশের গ্রামে পালিয়ে গেলাম। পরের দিন মিলিটারিরা এসে আমাদের ও আমাদের আশেপাশের সব ঘর পুড়িয়ে দিলো।

সেই সব দুর্বিসহ দিনের কথা মনে পড়লে আজও শিউরে উঠি। সেই সব দিনের কোনো মূল্যায়ন হয় না। এ শুধু অনুভব করা যায়। কতবার ভেবেছি আমার সেই ভয়ংকর অভিজ্ঞতা লিখে রাখবো। কিন্তু নানা পরিস্থিতির কারণে হয়ে ওঠেনি। আজ যারা তোমাদের মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতা বলার সুযোগ করে দিলো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

নানুর কাছে এই সব অমূল্য অভিজ্ঞতার কথা শুনে আমি কোথায় যেন হারিয়ে গেলাম। মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িত সকলকে আমার শ্রদ্ধা জানাই। সত্যি আমরা এসব কিছুই ভুলবো না।

সূত্র : জ- ১৪৮৩৫

সংগ্রহকারী:	বর্ণনাকারী:
জান্নাতুল ফিরদাউস	**হেনোয়ারা হক**
বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	প্রযত্নে: মজিবুল হক
৪র্থ শ্রেণি, শাখা-ক (দিবা), রোল: ০১	নতুন কলেজ রোড, ঝালকাঠী
	বয়স:৫৫, সম্পর্ক: নানু

কয়লার আগুনে রড জ্বলছে

সে তখন ১০ম শ্রেণিতে বগুড়া রোড এসসিজিএম স্কুলের ছাত্র। বরিশালকে তিন দিক দিয়ে হানাদার বাহিনী আক্রমণ করল– সড়ক, নৌ ও আকাশ পথে। সদর গার্লস স্কুলে আমাদের অল্প সময়ের জন্য ট্রেনিং দিয়েছিলেন মরহুম মেজর জলিল, ক্যাপ্টেন বেগ, প্রফেসর সামসুদ্দিন, মরহুম ফারুক ও আনিছ ভাই। গেরিলা ট্রেনিং, ভুত চাল, মানবিক চাল, বিলি চাল, অবশেষে সুইসাইড ট্রেনিংয়ের সময়টা ছিল উত্তপ্ত। থ্রি নট থ্রি, রাইফেল ছাড়া আমাদের কোন ভারী অস্ত্র ছিল না। বরিশাল আক্রমণের পর আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলাম। ক্যাপ্টেন নিজাম ভাই গৌরনদীতে। ৪০ কি: মি: পথ পায়ে হেঁটে গেলাম। কিছু দিন থাকার পর বরিশাল শহরে প্রবেশ করলাম খুবই সতর্কভাবে।

দাড়িয়াল বাবু মিয়ার বাড়ি ক্যাম্প করা হয়েছে। সেখানে গিয়ে ক্যাপ্টেন নাজির ভাইয়ের নির্দেশে শহরে এলাম জনগণকে বোঝাতে যে, মুক্তিযোদ্ধারা এখনও শহরে আছে। দিনের বেলায় জীর্ণ কাপড় পরিধান করে প্রাক্তন যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী নুরুল ইসলাম মঞ্জুর বাসার কাছে গোপন বাংকার থেকে বুলেট, গ্রেনেড, ম্যাগজিন দাড়িয়ালগামী ছোট্ট লঞ্চের মাস্টারের কাছে

পৌঁছাতাম। নিত্য দিনের কাজ কিন্তু সমস্যা হল কিছু চিহ্নিত রাজাকারদের নিয়ে। ওরা জানত আমরা মুক্তিসেনার দল।

১৪ কিংবা ১৫ আগস্ট, দিনটি ছিল শুক্রবার। শেষ রাতে কার্ফুর মধ্যেও সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ এবং গ্রেনেড চার্জ করে (বগুড়া রোড, পেসকার বাড়ি আমার জন্মস্থান) ঘরে এসে ঘুমাচ্ছিলাম। চৌকির নিচে কিছু গ্রেনেড ও মাটির পাত্রে ছিল অজস্র বুলেট– শুক্রবার লঞ্চে দাড়িয়াল পাঠাব।

আনুমানিক সকাল ৯/১০টার সময় দরজায় নাড়া পড়তেই দরজা খুলে দেখি একজন পাকসেনা এসএমজি বুকে তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। নীরবে নিঃশব্দে পাকসেনার হাতে ধরা দিলাম। ওখানেই বুটের আঘাত, চড় থাপ্পড় দিয়ে আমাকে দুর্বল করে দিল। তারপরে টেনে হিঁচড়ে রাস্তায় দাঁড়ানো একটি কালো রংঙের পিকআপে তুললো। সেই গাড়িতে অনেকেই ছিল। বর্তমান খেতাব পাওয়া মানিক ভাইয়ের ছোট ভাই, বাচ্চু আরো অনেকে। আমাদের নিয়ে যাওয়া হল বরিশাল টিএণ্ডটি অফিসের মধ্যে। গাড়ি থেকে নামিয়ে শুরু করল চাবুকের নির্যাতন। আর বলল, শালা মুক্তিফৌজ হ্যায়। আমাদের দোতলায় উঠিয়ে একটি রুমে তালা মেরে রাখা হল। মুজাহিদ বাহিনী ছিল কারারক্ষী। এক মুজাহিদ বললো, গতকাল এক ব্যাচ ধরে এনে রাতে ওখান থেকে নিয়ে নদীর পাড়ে গুলি করেছে, অতএব তোমরা জানাজার নামাজ পড়। সন্ধ্যা পর্যন্ত এই জগতে আছ। এই মুহূর্তে যদি মেরে ফেলত তাও ভাল ছিল। মৃত্যু যন্ত্রণা যে কি কষ্টের তা আমরা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না। মৃত্যুর যন্ত্রণা, অন্যদিকে আক্ষেপ বাংলাদেশের মানচিত্র দেখতে পেলাম না। ঠিক সন্ধ্যায় বন্ধ রুমের তালা খুলে গেল। খট খট শব্দে পাকসেনারা আসলো। এক জন বলে উঠলো, 'এ বিলকুল মেরা আদমি হ্যায়?' বরিশালের স্বনামধন্য ব্যক্তি মরহুম আজিজ সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ, এ বিলকুল মেরা আদমি হ্যায়।' 'ঠিক হ্যায়, উচকো লোককো ছোড় দাও। আর কই মুক্তি দেখেগা তো মেরানা খবরা মিলাগা।' এও কি সম্ভব! মুক্তি পাচ্ছি, বিশ্বাস হচ্ছিল না। মনে করলাম পিছন থেকে গুলি করবে। না সত্যিই বেঁচে গেলাম।

ক্রমশ হানাদার বাহিনী ও রাজাকারের দল দুর্বল হতে লাগল। আর আমরাও জোরদার হতে লাগলাম। মুক্তির জয়গান বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শুনে আনন্দে আত্মহারা। ৮ ডিসেম্বর ৯ নং সেক্টর বরিশাল শহরে বাংলার স্বাধীন পতাকা উড়ল। পালাতে শুরু করল রাজাকার, আলবদর, মুজাহিদদের দল। ভিআইপি কলোনি শেবাচিম-এর সামনে ১০৭ জনের মতো পাকহানাদার আটকা পড়ল।

যুদ্ধ চলছে ওদের সাথে, আমার ডান পাশে দেলোয়ার বারবার মাথা উঁচু করে গুলি ছুঁড়ছিল, নিষেধ সত্ত্বেও শুনে না। হঠাৎ ওর মাথায় গুলি লাগতেই পড়ে গেল। আমি ওর বুকের উপর পড়লাম। রক্ত আর রক্ত। ৩/৪ দিন পর নুরুল ইসলাম মঞ্জুর কাছে ওরা আত্মসমর্পণ করল। আমরা ঢুকে গেলাম ভিআইপি কলোনিতে। দেখলাম অনেক নির্মম অত্যাচারের আয়োজন। বিশাল কয়লার আগুনে রড জ্বলছে।

সূত্র : জ ১৪০৫৯

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. রিপন হাং	**আ. মালেক হাওলাদার**
ইউসেপ কাশিপুর টেকনিক্যাল স্কুল	নবগ্রাম, কড়াপুর রোড, ভাই ভাই ভিলা
৪র্থ ব্যাচ, ২য় পর্ব	উপজেলা: কোতয়ালী, বরিশাল

লাশ ভাসে পোলের নিচে

আমি তখন কাশীপুর হাই স্কুলে ৭ম শ্রেণিতে পড়ি। পাকিস্তানিরা বরিশালে ১৫ বৈশাখ বোমা মারে। আমার মা তখন উঠানে ডাল শুকাতে দেয়। উঠানের পশ্চিম পাশে পুকুর কাটা হয়। ঐ সময় পুকুরের ভিতরে সবাই আশ্রয় নেই। বিকাল বেলা শুনি আমার ফুপা বোমা পড়ে মারা গেছে। দুই দিন পরে তাকে হাসপাতাল থেকে বাড়ি আনা হয়। তারপর কফিন খোলা হয়। দেখলাম তার পিঠে সেল বিদ্ধ হয়েছে। তার সামনের দিক থেকে দেখলাম খাচাসহ কলিজা বেরিয়ে আছে। আমি দেখে ভয় পেলাম। বাবা বলল যে, তোর স্কুলে যাওয়ার দরকার নাই। আমি স্কুলে যাওয়া বন্ধ করলাম ঐ দিন থেকে। এক দেড় মাস পর পাকসেনারা বলল, স্কুল-কলেজ চাকরিতে যোগদান করতে। তাই আমি আবার স্কুলে যাওয়া শুরু করলাম।

আমাদের দুটি গাভি ছিল। গাভির দুধ নিয়ে বাজারে যেতাম। আমার বাড়ি থেকে পূর্ব দিকে নতুনাবাদ পোল। পোল দিয়ে আমি দুধ নিয়ে সদর রোডে যেতাম। তখন দেখতাম আশেপাশে আলবদর, রাজাকার ঐ পোলে ডিউটি করত। এক দিন আমাকে ধরে রাখল। আমার মাথায় হাত দিয়ে দেখল। দুই হাতের কনুই দেখল, দুই পায়ের হাঁটু দেখল। তারপর পা দিয়ে ধাক্কা দিল। আলবদর রাজাকার বলল, শালা বিচ্ছু বাহিনী। এ কথা বলে বসিয়ে রাখল বেলা বারটা পর্যন্ত। আমি তাকিয়ে দেখলাম মানুষের লাশ ভাসে পোলের নিচে। আমি ভয় পেয়ে কাঁদতে লাগলাম। তখন এক রাজাকার কি মনে করে আমাকে ছেড়ে দিলো।

এরপরে আরো ঘটনা আছে– কাশিপুর সিএন্ডবি অফিসের পশ্চিম পাশে রেনট্রি গাছের নিচে হড়ি গাছ আছিল। গাছের নিচে একটি মানুষ ছিল। মৃত অবস্থায় পকেটে একটি উইনসান কলম ছিল। তাকে কুকুরে টানে, কাকে মাথায় ঠোকরায়।

পরের ঘটনা- আষাঢ়-শ্রাবণে মুক্তিবাহিনী রাজাকারের উপর গুলিবর্ষণ করে নতুনাবাদ পোলের উপর। রাজাকাররা ফিসারি রোডে আসে। এরপর গোবিন্দ ঠাকুর নামের এক লোককে মেরে ধান ক্ষেতের ভিতর ফেলে দেয়।

আমি মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করি। আমার বাড়ি থেকে ভাত রেঁধে দিয়ে আসি। অনেক সময় বাড়ি থাকতে দিয়েছি। এক দিন আমাদের বাড়ি ঘেরাও দেয় পাকিস্তানিরা। আমরা পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ধান ক্ষেতে পালাই।

কাশিপুর হাই স্কুলের কাছে পোল ছিল। মুক্তিবাহিনী পোল ভেঙ্গে ফেলে, যাতে পাক সেনারা গাড়ি নিয়ে না যেতে পারে। সকালে পাকিস্তানিরা আসে, সেখানে মজিদ নামে এক দোকানদারকে মেরে ফেলে।

কার্তিক মাসে পাকিস্তানি বাহিনী চহুতপুর গ্রামে হামলা করে। এতে অনেক মানুষ মারা যায়। বারুজার হাটখোলায় রাজাকার আলবদরের সাথে মুক্তিবাহিনীর গোলাগুলি হয়। এতে দুইজন মুক্তিযোদ্ধা মারা যায়।

নতুন বাজারে রেড দিয়ে মানুষ ধরা হয়। অনেক লোক ধরা পড়ে। অনেককে মেরে ফেলে। আমাকে ধরা হয়। আমাকে বলে, গাড়িতে ওঠ। এই সময় আমি মনে মনে ভাবি এই বুঝি আমাকে গুলি করবে। মেজর বলল, হট যাও। অনেক মা বোনের ইজ্জত নেয়। এর কিছু দিন পর দেশ স্বাধীন হয়।

সূত্র : জ ১৪০৭৫

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. ফয়সাল কাজী	**কাজী শাহজাহান**
ইউসেপ কাশিপুর টেকনিক্যাল স্কুল	বয়স: ৫২ বছর, সম্পর্ক: বাবা
আইইইসি, রোল: ২৬	

মনু তুই চুপ কর, গীতা তুই রক্ষা কর

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের প্রথম সূত্রপাত ঘটে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে ঘুমন্ত বাঙালির উপর পাকহানাদার বাহিনী হামলা চালায়। ১৯৭১ সালের ২ এপ্রিল, আমার মা সেই সময়ের বর্ণনা দিয়েছেন।

তখন তার বয়স ছিলো মাত্র ৫ বছর। বাড়ি ছিলো মাহিলাড়া গ্রামে। পাকবাহিনী তাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলো। তারা সবাই ভয়ে পাশের ডোবায় লুকিয়েছিলো। সেখানে বেশি জল ছিলো না। ডোবার চারপাশে প্রায় ৫০০ মতো লোক প্রাণের ভয়ে লুকিয়েছিলো। আর তখন ঘটেছিলো এক মর্মান্তিক ঘটনা। গ্রামের এক রাজাকার মিলিটারি বাহিনীকে গাড়ি থামিয়ে তাদের সেই ডোবার কাছে ডেকে আনে। মিলিটারিরা সেই ডোবার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে চারদিকে ঘুরে ঘুরে গুলিবর্ষণ শুরু করে। একের পর এক সকলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে লাগলো। মিলিটারি বাহিনী রাজাকারের সাথে অন্য জায়গায় চলে গেলো। আমার মা ও দিদিমা ছিলো সেই ডোবায়। পাশেই কিছু দূরে বিলে একটি পানের বরজ। সেখানে লুকিয়ে ছিলো আমার নানা ও মামারা। তারা দেখলো যে, মিলিটারি চলে গেছে। তখন তারা সেখান থেকে এসে লাশ খুঁজতে লাগলো। দেখলো দিদিমা আমার মাকে নিয়ে এক পাশে বসে আছে। বুকে আগলে রেখেছে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ গীতা এবং আমার দিদিমার মুখ থেকে শুধু একটি কথাই বেরুচ্ছে - 'মনু তুই চুপ কর, গীতা তুই রক্ষা কর।'

মানুষের রক্তে ডোবার জল লাল হয়ে গেছে। আমার মা ও দিদিমা যে কীভাবে বাঁচলো তা কেউই জানে না। তখন আমার দিদিমার কোনো হুঁশ জ্ঞান ছিলো না। এমন কি মা ও দিদিমা ময়না কাঁটার উপর বসে আছে সে জ্ঞানও ছিল না। ২ এপ্রিলের পর আমার মামা মানিক চন্দ্র শীল মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে বিলে যাওয়ার সময় বলেছিলেন, এদেশ স্বাধীন না করে ফিরবো না। তিনি তার কথা রেখে বাড়ি ফিরে আসেন।

সূত্র : জ- ১৪৯১৫

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
জয়রাম দাস	**মঞ্জু রাণী দাস**
চাখার ফজলুল হক ইনস্টিটিউশন	জেলা: বরিশাল
৭ম শ্রেণি, রোল: ০২	সম্পর্ক: মা

আমরা তাদের ক্ষমা করে দেই

এখন আমি একজন মুক্তিযোদ্ধার জীবনী বলবো: তার নাম ছত্তার হাওলাদার। তখন তার বয়স ছিলো ১৮ বছর। তারা চার বন্ধু একসাথে ঘোরাফেরা করতো। তখন তারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিবে ভাবছিলো।

আমার চাচা শফিজ উদ্দিন বৃটিশ সেনাবাহিনীতে চাকরি করতেন। তিনি পালিয়ে বাড়িতে চলে আসেন এবং আমাদের প্রশিক্ষণ দেন। ১৫ এপ্রিল তারা চার বন্ধু মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন এবং রতন আলি শরীফ ছিলেন তাদের কমান্ডার। ফিল্ড কমান্ডার ছিলেন আব্দুর রব হাওলাদার।

প্রথমে দোয়ারিকা পাকবাহিনীর সাথে লড়াই করার জন্য মাটির গর্ত করে সেখানে সাত দিন অবস্থান করে তাদের সাথে হামলা চালিয়ে যাই। তারপর আমরা খবর পাই যে, মুক্তিযুদ্ধের কমান্ডার আব্দুল ওহাব খানের বাড়িতে হামলা হয়েছে। আমরা তখন সেখানে গিয়ে পাল্টা গুলি চালাই। অবশেষে পাকবাহিনী সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তারপর আমরা আগরপুর কবিরাজ বাড়িতে গিয়ে ক্যাম্প করি এবং আমাদের হাতে এক পাকিস্তানি ধরা পড়ে। রহিমগঞ্জ নদীর তীরে নিয়ে তাকে গুলি করি। কিছুদিন হাসপাতালে ক্যাম্প করি। সেখানে আমরা ২৪ জন রাজাকারকে ধরি এবং তারা তাদের অস্ত্র দেয় এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে। আমরা তাদের ক্ষমা করে দেই।

ইতিমধ্যে শুনতে পেলাম কমান্ডার রতন আলী শরিফের একটি শিশু ছেলেকে পাকসেনারা ধরে নিয়ে গেছে। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে দোয়ারিকা গিয়ে পাকবাহিনীর ক্যাম্পে ঘের দিয়ে গুলি চালাই। তাতে আমাদের দলের আব্দুর রশিদ ও আবুল মারা যায়। এদের বাড়িও দোয়ারিকায়। সে সময় আমরা শিশুটিকে উদ্ধার করতে পারিনি। সাত দিন পর আবার পাকবাহিনীর সাথে লড়াই করি। পরে পাকবাহিনী রতন আলী শরিফের ছেলেকে লোক দ্বারা বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়।

তারপর আমরা উজিরপুর গিয়ে ক্যাম্প করি। তখন আমাদের দলে ছিলো প্রায় ২৫০ জন। আমরা উজিরপুরের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলি। আবার ওহাব খান খবর দিলো যে, পাকবাহিনী তার এলাকায় হামলা করবে। এরপর আমরা সেখানে গিয়ে ক্যাম্প করি। ওই ক্যাম্প থেকে আমরা কেদারপুর, ভুতুরদিয়াসহ বিভিন্ন স্থানে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলি। তারপর আমরা বাড়িতে ফিরে আসি এবং শত্রু রাজাকাররা আমাদের বাড়ি ঘেরাও করে। তা শুনে আমরা ধানক্ষেতের মধ্য দিয়ে পালিয়ে ক্যাম্পে চলে আসি। আমাদের না পেয়ে বাড়ি ভাংচুর করে চলে যায়। পরে আমরা ক্যাম্পের সবাই বাড়িতে চলে আসি। ক্যাপ্টেন ওমর ও মেজর জলিল খবর দেয় আমরা যেন ৯ নং সেক্টরে চলে যাই।

এরপর আমাদের নিয়ে আগরপুরে ক্যাম্প করা হয়। আমরা ওখানে কয়েকজন রাজাকারকে মারি। তারপর আমরা আবার শিকারপুর চলে আসি। আমরা দুই জন বাজারে গিয়েছিলাম। তখন আমরা পাকবাহিনীর কাছে ধরা পড়ি এবং এলাকার বিভিন্ন লোকও ধরা পড়ে। আমাদের সারিবদ্ধভাবে নদীর তীরে দাঁড় করানো হলো গুলি চালানো হবে বলে। আমরা দুই জন পিছনে ছিলাম, হঠাৎ আমরা দুইজন নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে নদীর ওপারে সাঁতার কেটে চলে যাই। তারপর আমরা শিকারপুর ও দোয়ারিকার ফেরি দুটি ডুবিয়ে দেই। ফলে হানাদার বাহিনীর যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। তারপর বরিশাল সার্কিট হাউজে গিয়ে অবস্থান করি। এভাবে আমাদের

দীর্ঘ নয় মাস কেটে যায়। পরে হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পন করে এবং দেশ স্বাধীন হয়। আমরা ৯ নং সেক্টরে অস্ত্র জমা দিয়ে বাড়িতে চলে আসি। আমার অস্ত্রের নম্বর ছিলো ৮৫৩৫৬।

সূত্র : জ- ১৫২০৪

সংগ্রহকারী:	বর্ণনাকারী:
তামিম আলম	**মো. ছত্তার হাওলাদার**
জামেনা খাতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	গ্রাম+পোস্ট: রাকুদিয়া, থানা: বাবুগঞ্জ
৬ষ্ঠ শ্রেণি, রোল:৩৮	জেলা: বরিশাল
	বয়স: ১০০, সম্পর্ক: প্রতিবেশী

ছেলের সামনে বাঁশ ডলন দেয়

মুকুন্দ দেব মণ্ডল মুক্তিযুদ্ধকালীন বাটাজোর প্রাইমারি স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলেন। তার বয়স সেই সময় ছিলো ৪৮ বছর।

প্রথমে পাকিস্তানি সৈন্যরা এলাকায় আগমন করে মানুষকে গুলি শুরু করে। বাঙালিদের নানা রকম অত্যাচার করে মেরে ফেলে। চারদিকে হাহাকার শোনা যায়। শুরু হলো চারদিকে দৌড়াদৌড়ি। রাস্তায় রাস্তায় শোনা যেতো গুলির শব্দ। ভয়ে সবাই আতঙ্কিত হয়ে উঠলো। পাকিস্তানিরা অত্যাচার চালায় নিরীহ মানুষের ওপর। মুকুন্দ দেবের দুই ছেলে ও চার মেয়ে। তিনি পারছিলেন না এই ছেলে-মেয়ে ও পরিবার রেখে যুদ্ধে যেতে।

এক রাতে পাকিস্তানিরা প্রবেশ করলো তাদের ঘরে। ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র ও স্বর্ণালঙ্কার নিয়ে যায়। তার বড় মেয়ে ঘরে বসা ছিলো। তাকে দেখে পাকিস্তানিরা তলোয়ারের বাট দিয়ে মাথায় টাক দেয়, এতে সে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং চোখ ফুলে ওঠে। এটা সারতে অনেকদিন লেগেছিলো। মুকুন্দ দেব কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। তখন তার পরিবারসহ সবাই বাড়ি ছেড়ে চলে যায় উজিরপুর থানার বরাকোটা গ্রামে। চোর-ডাকাত ও পাকিস্তানিদের উপদ্রবে পরিবারসহ জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে তারা এক রাতে পোড়লিয়া যায়। সেখানে গিয়ে ক্যাম্পে থাকতো। সেখানে রুটি খেয়ে তারা দিন রাত দৌড়াদৌড়ি করতো। তাদের ছিলো না ঠিকমতো নিদ্রা ও আহার। তিনি দূর থেকে দেখেছেন অনেক মা-বোনদের নির্যাতন কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেননি।

মুকুন্দ দেব বলেন যে, তারা বাড়ি থেকে চলে যাবার পর পাকিস্তানিরা তাদের ঘর পুড়িয়ে দেয়। তাদের ঘরের আসবাবপত্রসহ তাকভর্তি বই পুড়ে যায়। যুদ্ধ চলাকালীন তার ছোট ভাই বাড়ি এসেছিলেন দেখতে। তখন তাকে কিছু লোক ধরে ফেলে এবং বলে, তোদের কোথায় কি আছে বল? না বললে মেরে ফেলবো। তিনি বলতে চাইলেন না। তখন রাজাকাররা তাকে বাঁশ ডলন দিয়েছিলো। মুকুন্দ দেব পোড়ালিয়া বসে জানতে পারলেন যে, তার প্রতিবেশী মহেন্দ্র তালুকদারকে ধরে তার ছেলের সামনে বাঁশ ডলন দেয় এবং তার গলায় ছুরি ঢুকিয়ে মারে।

এভাবে পাকিস্তানিরা নির্মম অত্যাচার চালায় বাঙালিদের উপর। তারা পেড়োলিয়া থেকে চলে আসেন সরিকল। সেখানে এসে দেখেন মুক্তিবাহিনী লঞ্চে করে সরিকল নদী পার হচ্ছে। এমন

সময় পাকিস্তানিরা গিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের মেরে ফেলে এবং তাদের লঞ্চ ভেঙে ফেলে। মুকুন্দ দেব সরিকল থেকে চলে যান মুলাদি। মুলাদি থেকে তিনি বাড়ির পরিবেশ দেখতে আসেন। দেখে ফিরে যাবার সময় পাকিস্তানিরা তাকে ধরে ফেলে এবং বলে আপনার নাম কি ও আপনি কোন ধর্মের? তখন তিনি বললেন, আমার নাম মুকুন্দ দেব মণ্ডল এবং আমি হিন্দু। তখন তারা মারার জন্য উদ্যত হয়েছিলো। তখন একটি পাকিস্তানি লোক বলে, 'একটা মাত্র হিন্দু ছাড়দে ছাড়দে।' তখন তারা ছেড়ে দিলো এবং তিনি মুলাদি এসে পড়লেন। তিনি দেখেন যে নিরীহ মানুষগুলো বসে থাকেনি। তারাও ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই কুকুরদের ওপর। তখন যুদ্ধ করার জন্য এগিয়ে এলেন জলিলের দল। এই দলে ছিলেন মুকুন্দ দেবের স্ত্রী, ভাই-বোন সমীরণ বিশ্বাস ও বীথিকা বিশ্বাস। তারা তখন যুদ্ধ করেছেন পাতার রস খেয়ে। যুদ্ধে বীথিকা বিশ্বাসের হাতে গুলি লেগেছিলো। তিনি তখন চলে যান ভারতে। লাখ লাখ শহীদের বিষণ্নতায় ছিলো এই বাংলার মানুষ।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর জানতে পারেন পাকিস্তানিরা সম্পূর্ণভাবে বিতাড়িত হয়েছে। বাঙালিরা ফিরে পায় সোনার বাংলা। তারপর তিনি নিজ গ্রামে ফিরে আসেন ও বসবাস করতে শুরু করেন।

সূত্র : জ- ১৫৫৭৭

সংগ্রহকারী:	বর্ণনাকারী:
প্রতিভাময়ী মণ্ডল	**মুকুন্দ দেব মণ্ডল**
বাটাজোর অশ্বিনী কুমার মাধ্যমিক বিদ্যালয়	জেলা: বরিশাল
৮ম শ্রেণি	বয়স: ৮৮, সম্পর্ক: দাদা

ই ভিটেমাটি ছাইড়া কোথাও যামু না

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমার মেজ কাকির বয়স ২০ বছর। যখন তিনি শুনলেন যে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী বাংলার মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করছে এবং সামনে যাকে পাচ্ছে তাকে হত্যা করছে তখন তিনি আমাদের বাড়ি ছেড়ে তার বাবার বাড়িতে চলে গেলেন।

তার বাবা তাদের বাড়ির পাশের বাগানে একটি বিশাল গর্ত করলেন, যাতে তার ভিতর ৭-৮ জন লোক থাকা যায়। তিনি ছোট ছোট গাছ কেটে সেগুলোকে গর্তের উপর সারিবদ্ধভাবে রেখে তার উপর মাটি চাপা দেন। উপর থেকে কেউ বুঝতে না পারে যে ভিতরে লোক আছে। তার বাবা গর্তের একটি ছোট মুখ রাখলেন যাতে নিচে নামা যায়। গর্তের পাশে কিছু লতাপাতা রাখলেন, যেন ভিতরে নেমে লতাপাতা দিয়ে ঢেকে রাখা যায়।

আমার মেঝ কাকি একদিন তাদের পরিবারের সবার জন্য রান্না করছিলেন। তখন তাদের পাশে এলাকার লোকজন পালিয়ে আসল এবং অন্য অনেক লোকের আর্ত চিৎকার তারা শুনতে পেল। তখন তাদের পরিবারের সবাই সেই গর্তে গিয়ে পালালো। যখন মিলিটারিরা চলে গেল তখন তারা গর্ত থেকে বেরিয়ে আসল এবং দেখলো যে, তাদের পাশের গ্রামে দাউ দাউ করে

আগুন জ্বলছে। সেই সাথে অনেক মানুষকে হত্যা করে মাটিতে ফেলে রেখেছে। অনেক গৃহপালিত পশুপাখিও আগুনে পুড়ে মারা গেছে। তারপর তার মা একদিন তাদের টাকা-পয়সা, স্বর্ণের অলংকার গাছের শুকনা পাতার ভিতর রেখে পাতার বস্তা বাগানে ফেলে রাখলেন। যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে বস্তার ভিতরে টাকা-পয়সা আছে।

একদিন তার মা তাদের পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভারত চলে যেতে চাইল কিন্তু তার বাবা বলল যে, 'ই ভিটেমাটি ছাইড়া কোথাও যামু না। মরলে এইখানে মরমু বাঁচলে এইহানে বাচমু।' তার মার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তার বাবার অনিচ্ছার কারণে তারা যেতে পারেনি। তাই সেই সময় তারা অনেক কষ্টে তাদের জীবন বাঁচিয়েছিল।

আমি আরও একটি বর্ণনা শুনেছি আমার প্রাইভেট টিচারের কাছ থেকে। তার বয়স তখন ৬ বছর। তার বড় ভাই তখন বিএ পাশ করে কেবল চাকরিতে যোগদান করেন। তিনিই ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। যখন তারা শুনলেন যে মিলিটারিরা তাদের পাশের গ্রামে হত্যাকাণ্ড শুরু করেছে তখন তাদের পরিবারের সবাই মিলে দূরের গ্রামে পালিয়ে যাচ্ছিল। পথের একটি বড় খাল সাঁতরিয়ে খালের ওপার চলে গেল। আমার মাকে তার বড় ভাই তার কাঁধে করে খালের ওপার নিয়ে গেল। তাদের সবাইকে নিরাপদ স্থানে রেখে তার ভাই ও তার এক বন্ধু মিলে তাদের বাড়িতে আসল দেখতে যে মিলিটারিরা চলে গেছে কিনা। কিন্তু মিলিটারিরা তখনও যায়নি। মিলিটারিরা তাদের দেখতে পেয়ে গুলি করে তাদের মারল। পুত্রশোকে তার বাবা পাগল হয়ে যান। যুদ্ধের পর তিনি মারা যান।

সূত্র : জ ১৪৪৮৪

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
কামরুল হাসান	**নূরজাহান বেগম**
মাধবপাশা চন্দ্রদ্বীপ হাই স্কুল ও কলেজ	গ্রাম: পাংশা, পোস্ট: মাধবপাশা
৮ম শ্রেণি, খ শাখা, রোল: ৩৬	উপজেলা: বাবুগঞ্জ, জেলা: বরিশাল

চেয়ে চেয়ে খাবার খেয়েছিলেন

আমার বাবা ৯নং সেক্টরের একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তখন ৯নং সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন মেজর জলিল, ব্যাচ কমান্ডার ছিলেন আব্দুল মজিদ খান। তিনি বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করেন। তিনি ৭ মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণ শুনে বুঝতে পেরেছিলেন যে, মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে এদেশ থেকে তাড়ানো যাবে না। ২৫ মার্চ যখন পাকিস্তানিরা বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন আমার বাবা নিজ বাসস্থানে অবস্থানরত ছিলেন।

আমার বাবা যেখানে ছিলেন সেখানেও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এসেছিল। তখন আমার বাবা ও দাদা-দাদি অন্যত্র লুকিয়ে পড়েন। আমার বাবার পরিবারের কাউকে মারতে না পারলেও ঐ রাতে পাকিস্তানিরা আমার বাবার ঘরের আশেপাশে অনেক লোককে মেরে ফেলে। কিন্তু তখন আমার বাবা প্রতিবাদ করতে পারছিল না, কারণ তার দুটো হাতই ছিল শূন্য।

আমার বাবা ২৭ মার্চ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র কালুরঘাট থেকে জিয়াউর রহমানের ভাষণ শোনার কয়েকদিন পরেই মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন। তিনি মুক্তিবাহিনীতে থাকাকালে অনেক মৃত্যুর দৃশ্য দেখেছেন। আমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রাম সোলনায় পাক হানাদার বাহিনী অনেক হিন্দু পুরুষ-মহিলাকে গুলি করে হত্যা করে। দোয়ারিকা ও শিকারপুর এলাকায় আমার বাবার মুক্তিবাহিনীর সাথে পাকিস্তানিদের সংঘর্ষ হয়। সেই সংঘর্ষে অনেক পাকিস্তানি মারা যায়। চাতর গাফখান নামক স্থানে মুক্তিবাহিনী ও পাকবাহিনীর সাথে সংঘর্ষ হয়। সেখানে আমার বাবাও ছিলেন। সেই সংঘর্ষেও অনেক পাকিস্তানি মারা যায়।

আমার বাবাসহ অনেক মুক্তিযোদ্ধা বরিশালের সাতমাইল ক্যাডেট কলেজে প্রশিক্ষণ নেন। তাছাড়া দেশের আরও বিভিন্ন জায়গায় তিনি প্রশিক্ষণ নেন। ঐ ক্যাডেট কলেজে ছিল মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প। আমার বাবাসহ অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে তিন চার দিন না খেয়ে থাকতে হয়েছিল। তাদের বৃষ্টিতে ভিজে রৌদ্রে পুড়ে বনজঙ্গলে দিন কাটাতে হয়েছিল। কিন্তু আমার বাবা তবু মুক্তিবাহিনী থেকে ফিরে আসেননি। তিনিসহ অনেকে অনাহারে কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মানুষের ঘরে চেয়ে চেয়ে খাবার খেয়েছিলেন। তাছাড়াও অনেক দয়াবান লোক তাদের কলা, রুটি, চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করেছেন।

আমার বাবার এলাকায় একজন রাজাকার ছিলো। তার নাম সিরাজ মাওলানা। সে ছিল সোলনা নিবাসি। এই রাজাকার পাকিস্তানিদের খবর দিয়ে তাদের হাতে অনেক লোক মারিয়েছিল। এই রাজাকারকে মুক্তিবাহিনী মেরে ফেলেছিল। আমাদের এই গ্রাম থেকে অনেক লোক মুক্তিবাহিনীতে যোগদান করেছিল। পাশের বাড়ির হাকিম ও বারেকসহ আরো অনেক লোক এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আমার বাবা দীর্ঘ নয়টি মাস পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অনবরত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধ করতে করতে একদিন তাদের বিজয় সূচিত হল। সেই দিনটি হল ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল।

আমার বাবা আরও বলেছেন, বাঙালিদের এই বিজয় বয়ে আনতে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্ত ও দুই লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। সূচিত হল নতুন এক দেশ যার নাম বাংলাদেশ। আমার বাবা অর্থাৎ এই মহান ব্যক্তি মুক্তিযুদ্ধ করেও তার নাম কিন্তু এখনো পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে ইতিহাসের পাতায় ওঠেনি। কারণ চাকরির সময় তার সার্টিফিকেট জমা দিয়েছিলেন। সেই সার্টিফিকেট তারা আর আমার বাবাকে ফেরত দেয়নি। তাই এখন তিনি মুক্তিযোদ্ধা ভাতাও পান না। কিন্তু তাতে আমার বাবার দুঃখ নেই।

সূত্র : জ ১৪৪৯৫

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. মেহেদী হাসান	**ইসহাক আলী**
মাধবপাশা চন্দ্রদ্বীপ হাই স্কুল ও কলেজ	গ্রাম: বাড়ইখালী, পোস্ট: মাধবপাশা
৯ম শ্রেণি, বিজ্ঞান শাখা, রোল: ০৪	উপজেলা: বাবুগঞ্জ, জেলা: বরিশাল

তাকেও বাঁচতে দিল না ওরা

দিনটি ছিল ১৩ বৈশাখ। ১৯৭১ সালে আমার বিয়ে হয়েছে আট মাস। প্রথম যে সময় আমাদের এদিকে যুদ্ধ শুরু হয় তখন আমরা সবাই পালিয়ে যাই বাগানে। রাতের অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। শুধু শোনা যায় গুলির আওয়াজ। যখন মিলিটারিরা চলে গেল তখন আমরা দেখি অনেক মানুষকে মেরে ফেলেছে। দোসরা শ্রাবণ লক্ষ্মীপূজা দিচ্ছিলো আমার পিতা ও আমার জেঠা। হঠাৎ মিলিটারিরা আমার বাবা-জেঠাকে গুলি করে। আমার বাবাকে ওরা তিনটি গুলি করেছিল। আমার বাবা নিহত হন। আমার জেঠা একটি গুলি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। পরে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বাড়ি আসার সময় দেখি কত ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিল ওরা। আমার দেওর শুধু বলত, বৌদি, আমরা হিন্দু, চলো তুমি আমি আমরা সবাই আরবি শিখি। নইলে আমাগো মেরে ফেলবে। ঠিক তখনই এল এক গাড়ি মিলিটারি। আমি পালিয়ে যাই। কিন্তু দেওর মাথায় টুপি দিয়ে হাঁটছিল। পাকবাহিনী তাকে বলল, তুমকো হিন্দু নেই মুসলিম? তখন সে বলল, সাব আমি মুসলিম। তখন তাকে ছেড়ে দিল। আবার আরেক দিন এসে আমাকে বলল, বৌদি ওরা আসছে। তুমি পালিয়ে যাও। আমি পালিয়ে গেলাম। পাকবাহিনী ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিল। মাত্র দশ দিন হল এক মেয়ের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু তাকেও বাঁচতে দিল না ওরা।

আমরা শুধু বসে আছি কবে দেশ স্বাধীন হবে। অবশেষে দেশ স্বাধীন হল ১৬ ডিসেম্বর।

সূত্র : জ ১৪৫০৪

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
রিপন চক্রবর্তী	**মলিনা রানী**
মাধবপাশা চন্দ্রদ্বীপ হাই স্কুল ও কলেজ	গ্রাম: বাদলা, পোস্ট: দেহেরগাতি
৯ম শ্রেণি, শাখা: বানিজ্য, রোল: ২৮	উপজেলা: বাবুগঞ্জ, জেলা: বরিশাল
	বয়স: ৬২ বছর, সম্পর্ক: ঠাকুরমা

গেট ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়ে

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ মিছিলে গোলাগুলি হয়। অনেক লোক মারা যায়। অনেক লোক আহত হয়। তারপর সাদেক হোসেন এবং তার সাথে আরো কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা যান বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে। ১৫ মার্চ এবং ১৬ মার্চ তার সাথে সাক্ষাৎ করে। এরপর আবার তারা খুলনায় রওয়ানা হন। খুলনায় আর্মির সঙ্গে যুদ্ধ হয়, এতে অনেক লোক আহত হয়। এরা তাদের দেখাশোনা করেন। তারপর খুলনায় বসে সাদেক হোসেন অ্যারেস্ট হন। কারণ তিনি আবু সুফিয়ান সাহেবের বাসায় থাকেন। সেখানে থেকে মানিকতলা সরকারি গোডাউন হতে জোর করে তারা চাল বিতরণ করেন। তারপর তারা দৌলতপুর থানা এবং অভয়নগর থানা থেকে রাইফেল গুলি এনে সুফিয়ান সাহেবের বাসায়

রাখেন। যখন রাত প্রায় একটা বাজে তখন তিন গাড়ি আর্মি এসে বাসা অ্যাটাক করে এবং গেট ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়ে। এ সময় তিনি বিছানায় শোয়া অবস্থায় তার বুকে রাইফেল ধরে বললো, তোমার নাম কি? তিনি বললেন, এসহাক। তখন তিনি আল্লাহকে ডাকতে লাগলেন। আর্মিরা বললো, সাদেককে চেনো। তারপর বললো, সুফিয়ান সাহেবকে চেনো। তিনি বললেন, তারা ঢাকা গেছে। তারপর তাকে গরিব ভেবে ছেড়ে দিলো। তিনি সবাইকে মাইক দিয়ে বললেন, এই ঘটনা হয়ে গেছে। তারপর বললেন, তোমরা সবাই রেল লাইনের পাত ছুটিয়ে ফেলো। তখন তারা পাত ছুটিয়ে ফেললো যাতে আর্মি আসতে না পারে। তারা বাংকার করে এবং অনেক দিন সেখানে গোলাগুলি হয়। তারপর তিনি দেশের বাড়ি আসেন এবং দল গঠন করেন। তাদের ক্যাম্প বিনয়কাঠি তৈরি করে তাদের সাথে যুদ্ধ হয়। প্রায় সকাল ৮টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে। অনেক আর্মি মারা যায়। সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের দুইজন লোক আহত হন এবং একজন মারা যান।

সাদেক হোসেন পরে বলেন, আমরা ৮ ডিসেম্বর শহরে উঠি এবং ১০ ডিসেম্বর শুক্রবার গুলি করে অনেক পাকসেনাকে আহত করি। তখন আমরা শুক্রবার দিন নামাজের পর অ্যাটাক করি ৩০ গোডাউন। আনুমানিক পৌনে পাঁচটার সময় সাদেক হোসেন আহত হন। এ অবস্থায় তাকে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই গ্রামে আর্মিরা দুই তিন বাড়িতে আগুন দেয়। সে সময় বাংলাদেশের অনেক লোক অনাহারে মারা গেছে। অনেক লোক মুক্তিযুদ্ধে আহত হয়েছে। অনেক মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে এই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে এবং অনেক মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হয়েছেন। এই হলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস।

সূত্র : জ- ১৪৫০৫

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
সঞ্জিব	**সাদেক হোসেন দুয়ারি**
মাধবপাশা চন্দ্রদ্বীপ হাই স্কুল ও কলেজ	গ্রাম: হরিদাস কাঠি, পোস্ট: মাধবপাশা
৯ম শ্রেণি, ব্যবসায় শিক্ষা শাখা, রোল: ১৯	উপজেলা: বাবুগঞ্জ, জেলা: বরিশাল
	সম্পর্ক: প্রতিবেশী

মাছে কিছুটা খেয়েছে

ডিসেম্বর মাসে যখন ধান পেকে উঠেছে তখনকার একটি ঘটনা। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ক্যাম্প ছিলো শিকারপুর নদীর ওপারে, আর একটি ক্যাম্প ছিলো দোয়ারিকা নদীর দক্ষিণ পাড়ে। সেখানে ছিলো শুধু কাঁটাবাহার গাছ। তাতে কাঁটা আর কাঁটা– মানুষ হাঁটতে পারে না। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের গাড়িতে করে দোয়ারিকা আসছিল। সেখানে ছিলো একজন মুক্তিযোদ্ধা। সাথে সাথে সে চলে যায় সিকদার বাড়ি। মুক্তিযোদ্ধারা দেখে তারা বোটে করে নদীর মাঝখানে চলে গেছে। পরে মুক্তিবাহিনী চলে যায়।

ওপারে কাঁটাবাহার গাছের ভিতরে তিনজন লোক বাস করতেন। একদিন ধান ক্ষেতের ভিতর দিয়ে আসছিলো। এটা দেখে পাকিস্তানিরা সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালায়। সেখানে ছিলো রসিদ, কামাল

ও রত্তন। রসিদের কপালে, কামালের বুকে এবং রত্তন শরীফের হাতে গুলি লাগে। যাদের বুকে কপালে লাগে তারা মারা যায়।

আরেকটি ঘটনা: এক দাদা চাকরি করতো খুলনা জুট মিলে। পাকিস্তান হানাদারবাহিনী একদিন হঠাৎ করে এসেছিলো তাদের জুটমিলে। সে তালা লাগিয়ে দেয়। ফলে শ্রমিকদের তারা খুঁজে পায়নি। তারা দেখে শ্রমিকরা পালিয়েছে। যখন পাকবাহিনী চলে যায় তখন তারা বের হয়ে আসে। তারপর তারা যার যার বাড়ি ঘরে চলে যায়। আমার দাদা গ্রামের মধ্যে দিয়ে আসছিলো। হঠাৎ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে এসে দেখে পাকবাহিনী টুঙ্গিপাড়া গ্রামে আগুন দিয়েছে। অনেক যুবতী মেয়েদের ধরে নিয়ে যায় তাদের ক্যাম্পে। সে কোনো রকমে তার জীবন নিয়ে পালিয়ে আসে।

যখন বরিশাল এলেন তখন তার চাচাতো ভাই মো. মুজাহার হাংকে পাকবাহিনী ধরে নিয়ে যায় তাদের ক্যাম্পে। তা দেখে কেউ কিছু বলতে পারছে না। কারণ তাহলে তাদেরও মেরে ফেলবে। তারা পরাণের ভয়ে চুপচাপ চলে এসেছে। বাড়ি এসে খবর দেয় যে মুজাহারকে ধরে নিয়ে গেছে। বাড়ির সবাই ভাবলো যে, সে মারা গেছে। কিন্তু আল্লাহর রহমতে সে বেঁচে আছে। তাকে হাত-পায়ে রশি বেঁধে ছোট ব্রিজ থেকে ফেলে দেয়া হয়। তখন সে একটি কচুরিপানার ওপরে পড়ে। সে দুই দিন পানিতে ছিলো। তাকে মাছে কিছুটা খেয়েছে। পরে ভেসে যেতে যেতে একটি চরে বেধে থাকে। সেখানে ছেলেরা কচুরিপানা সরিয়ে মাছ ধরছিলো। তখন ছেলেরা তাকে দেখতে পায়। তারপর তাদের বাবা-মাকে ডেকে আনে এবং তাকে নদীর তীরে উঠানো হয়। তার রশির বাঁধন খুলে দেয়া হয়। তাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়।

আমি নিজের চোখে দেখিছি তার গায়ে, কোমরে রশির দাগ রয়েছে। তার কী ভাগ্য যে, সেখানে ছিলো তার বোনের শ্বশুর বাড়ি। সেখানে যেয়ে উঠে। তারপর তাকে বাড়ি নিয়ে আসা হয়। এতে বাড়ির সবাই খুব খুশি হয়েছিল। সবাই জানে সে মারা গেছে। কিন্তু রাব্বুল আল্লাহ তালা বাঁচিয়ে এনেছিল।

সূত্র : জ- ১৫২২০

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
তুহিন হোসেন	**ফুল জাহানারা বেগম**
জামেনা খাতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	জেলা: বরিশাল
৭ম শ্রেণি, রোল: ৪৮	বয়স: ৫৫, সম্পর্ক: ফুফু

পাকবাহিনী সব জানে

আমার নানার নাম ছিলো সৈয়দ আ. জব্বার। তিনি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। চাকরি করতেন আর্মিতে। তিনি ছুটিতে বাড়ি এসে আর আর্মিতে যোগ দেননি। বরিশাল থেকে নূরুল ইসলাম মনজু আমার নানা সৈয়দ আ. জব্বারকে তিনশ লোক দিয়ে কুমিল্লা পাঠিয়ে দিলেন। এরপর যুদ্ধে ৩০০ জনের মধ্যে বরিশাল ফিরে আসেন ৭ জন। বরিশাল এসে তাকে শেরে বাংলা এ.কে

ফজলুল হক কলেজের ছাত্রদের ট্রেনিং করানোর দায়িত্ব দেয়া হয়। তাকে চাল, ডাল, চিনি, গম, আটা, তৈলসহ ২৫ জনের খাবার দিয়ে দিয়েছিলো।

আবার একদিন নানা বরিশাল থেকে শিকারপুর আসছেন। সেদিন রবিবার, ১৯৭১ সাল। সেদিন দুপুর দুইটায় পাকবাহিনী ঢাকা থেকে বরিশালে আসলো। আমার নানা রাইফেল নিয়ে একটি ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে গুলি দিবে এমন সময় দেখে বহু গাড়ি। আমার নানা সৈয়দ আ. জব্বার নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য ব্রিজের নিচে কাদার ভিতর পালিয়েছিলেন। পরে পাকবাহিনী এসে ঐ দিন শিকারপুর পেরিয়ে বরিশালে পৌঁছায়। পরে নানা শিকারপুর বিজয় ডাক্তারের বাড়িতে মাটির নিচে গর্ত করে আত্মগোপন করেন। তারপর তিনি আর বাড়ি আসেন না। আমার নানু চিন্তায় অস্থির। তারপর রাত একটায় নদীর ওপারে আশু বাবুর গোফার রাস্তার মাথায় এসে তার ছোট ভাই সৈয়দ আ. মালেককে ডেকেছিল। তার ছোট ভাই ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে ওপার থেকে নদীর এপার রাকুদিয়ায় তার নিজ বাড়ি নানাকে নিয়ে আসেন। তখন তার কাছে ছিল যুদ্ধের জন্য কিছু অস্ত্র। যখন কুমিল্লা গিয়েছিলেন এগুলো তাকে নূরুল ইসলাম মনজু দিয়েছিলেন। তারপর সেই অস্ত্র বাড়ি ফিরে গর্ত করে মাটিতে পুঁতে রাখেন। অস্ত্র রেখে উপরে গরুর খাঁচা, খড়কুঁটা দিয়ে গরু বেঁধে রাখে।

তারপর পাশের বাড়ির গ্রাম্য মেম্বার সৈয়দ জাফর আলী রাত চারটায় এসে বললো যে, তুমি কোথাও চলে যাও। আমাদের এই গ্রামে হিন্দু আছে এবং তুমি আর্মি। তুমি ছুটিতে এসেছো, পাকবাহিনী সব জানে। আমাদের এই রাকুদিয়া গ্রাম আক্রমণ করবে পাকবাহিনী, আমরাও চলে যাবো। তখন নানি গুটিয়া নয়না গ্রামে গিয়ে পালায় ও গ্রামের সবাই পালিয়ে যায়। ১৫ দিন পর আমার নানা সৈয়দ আ. জব্বার তার মা-বাবা, স্ত্রী ও পুত্র নিয়ে বাড়ি দেখতে আসেন। আসার একদিন পর মেজর জলিল নানার সঙ্গে কথা বলতে আসেন এবং দুপুরে খানা খান। তিনি নানাকে বলেন, তুমি রতন আলীকে নিয়ে উজিরপুর থানার গনেশ ডাক্তারের বাড়ি পাহারা দিবে। পাকবাহিনী যেনো না হামলা করে। তখন পরপর পাকবাহিনী দুইবার আমার নানা বাড়িতে যায়। কিন্তু তারা সৈয়দ বংশকে খুব শ্রদ্ধা করতো। তাই তারা বললো, আপনাদের বাড়ির সামনে সৈয়দ বাড়ির সাইন বোর্ড টানান। তাহলে কেউ আর আপনাদের বাড়িতে আসবে না।

পরে সেখানে নানারা ফেরি ও শিপ ডুবিয়ে দেন। নানা ছোট ডিঙ্গি নৌকার উপরে তরকারি এবং নিচে অস্ত্র নিয়ে কালিঘাট বাজারে আসেন। সেখানে একটা শিপ আসে। তখন তিনি শিপ সার্চ করে কিছু পাননি। তারপর দুস্কৃতিকারীরা তাকে তার নৌকায় আক্রমণ করে। দুই দিনের প্রচণ্ড যুদ্ধে বাজারের সব লোক ভয় পেয়ে পালিয়ে যায়। পরে ২১ শ্রাবণ দুই ঘটিকার সময় আমার দুই নানা সৈয়দ আ. জব্বার ও তার ছোট ভাই সৈয়দ আ. মালেক একই স্থানে শাহাদাত বরণ করেন। তাদের মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়। তাদের মা দুই ছেলের মৃত্যুর শোকে তিন মাস পরে শাহাদাত বরণ করেন। তারপর দেশ স্বাধীন হয়।

সূত্র : জ- ১৫২৩৬

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মাহজুবা তাজরি	**হেনা বেগম**
জামেনা খাতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	গ্রাম: রাকুদিয়া, থানা: বাবুগঞ্জ
৬ষ্ঠ শ্রেণি, রোল: ৪৩	জেলা: বরিশাল

বয়স: ৭৫, সম্পর্ক: নানি

ভিতরে গিয়ে অজ্ঞান

আমাদের সেই মহান যুদ্ধের কথা মনে করলে কখনও মনে ভয় হয়। আমরা যুদ্ধের সময় যেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী দেখতাম সেই পানির মধ্যে ডুব দিয়ে থাকতাম। যখন যুদ্ধ শুরু হয় তখন আমরা ঘরের ভিতর গর্ত করে তার ভিতরে ঢুকে থাকতাম। যখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাড়ির ভিতর দিয়ে যেত তখন বুট জুতার শব্দ শুনতে পেতাম। তখন সবাই চুপচাপ থাকতাম।

একদিন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সামনে পড়েছিলাম। তখন আমি বাজারে যাচ্ছি। পাকিস্তানিরা আমাকে দেখে ডাক দিয়ে তাদের কাছে যেতে বললো। তারপর আমাকে বললো, তুই কোথায় যাস? আমি বললাম, স্যার, আমি বাজারে যাই। তখন আমি ভেবেছিলাম আমি বুঝি এখানেই শেষ। তারপর আমাকে ছেড়ে দিলো। আমি পিছনে আর না তাকিয়ে সোজা বাড়ি আসলাম। তারপর সন্ধ্যার সময় গোলাগুলির শব্দ হলো। তারপর খবর পেলাম শত শত মানুষ মেরে ফেলেছে। ওই সময় শুনি কি, হানাদারবাহিনী আমাদের বাড়ি আসছে। তারপর আমাদের যে ঘরের ভিতর গর্ত ছিল সবাই সেই ঘরে ঢুকে পড়েছি। তারা আমাদের ঘরের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে। হঠাৎ করে আমাদের ঘরে চার পাঁচজন ঢুকে পড়েছে। তবে আমাদের আর দেখে না। তারপর হানাদাররা আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। আমরা সবাই ভিতর থেকে এক এক করে বের হলাম। আমি বাড়ি থেকে বের হয়ে দেখি ২০-২৫ জন লোক, পিছনে হাত বাঁধা আর বুকের ভিতর গুলি। তা দেখে আমি চিৎকার করে বাড়ি গিয়ে ঘরের ভিতরে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়লাম। তারপর আমার জ্ঞান নেই। তারপর আমি ঘর থেকে জামা কাপড় গুছিয়ে ব্যাগে ভরে ঘর থেকে পালিয়ে যাওয়া শুরু করলাম। তারপর মেইন রাস্তায় গিয়ে দেখি আমিসহ হাজার হাজার লোক গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আমরা সবাই তাদের সাথে যেতে শুরু করলাম।

সূত্র : জ- ১৫২৪৪

সংগ্রহকারী	বর্ণনাকারী
মো. সাঈদ হোসেন	**হাবিব হাওলাদার**
জামেনা খাতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয়	জেলা: বরিশাল
৭ম শ্রেণি, শাখা, রোল: ৪৯	বয়স: ৭৫, সম্পর্ক: দাদা

মরার ভিটা

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরীহ মানুষের উপর। এ সময় বরিশাল জেলার বাটাজোর গ্রামে পাকিস্তানিরা হামলা চালায়। তারা হত্যা করে এদেশের অগণিত

মানুষ। পাকবাহিনী বাটাজোর বাজারে শ্রী শ্রী দুর্গা মন্দিরের সামনে হত্যা করে অনেককে। তারা নিরীহ মানুষের মাথা কেটে ঝুলিয়ে রেখেছিলো মন্দিরের চারপাশে।

আমার এক নানা যুদ্ধের সময় জমিতে ধান কাটছিলো। এ সময় পাকিস্তানি বাহিনী তাকে গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং তার সাথে থাকা তার কিছু বন্ধুকেও হত্যা করে। বাটাজোর গ্রামে মফেজউদ্দিন বারীর বাড়ির সামনে একটি কালভার্ট ছিলো। সেখানে কালভার্টের নিচে হত্যা করে এদেশের অনেক তাজা প্রাণ। বাটাজোরের উত্তর দিকে মরার ভিটা নামক স্থানে একটি দিঘি ছিলো। দিঘি শুকিয়ে গিয়ে দিঘির উপর ছিলো লতাপাতা, জঙ্গল। তার নিচে গিয়ে পালিয়েছিলো বাটাজোর গ্রামের প্রায় এক হাজারের মতো নিরীহ মানুষ। পাকিস্তানি বাহিনী দিঘির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটি শিশু চিৎকার দিয়ে ওঠে। চিৎকার শোনার সাথে সাথে তারা গুলি চালাতে লাগলো এবং যত মানুষ ছিলো তারা সবাই মারা গেলো, রক্তে লাল হয়ে গেলো দিঘি। এ থেকে এটা মরারভিটা নামে পরিচিত।

বাটাজোর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ছিলো পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প। পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে প্রাণ হারায় অনেক মুক্তিযোদ্ধা। এ সময় আসেফ নামের একজন মুক্তিযোদ্ধা মারা যায়। এ যুদ্ধের সময় পুড়িয়ে দেয়া হয় হাজার হাজার ঘরবাড়ি। আমাদের বিদ্যালয়ের পূর্বের প্রধান শিক্ষক মরহুম গোলাম হোসেন শিকদারের বাড়ি এবং প্রাক্তন চেয়ারম্যান পরিমল চক্রবর্তীর বাড়ি পুড়িয়ে দেয় তারা। পাকিস্তানি বাহিনী কেড়ে নেয় অনেক মায়ের সন্তান। আমরা ৩০ লক্ষ শহীদের প্রাণের বিনিময়ে পেয়েছি আমাদের স্বাধীনতা।

সূত্র : জ- ১৫৬০৬

সংগ্রহকারী:	বর্ণনাকারী:
শারমিন খানম	**সেকেন্দার হাং**
বাটাজোর অশ্বিনী কুমার মাধ্যমিক বিদ্যালয়	জেলা: বরিশাল
৯ম শ্রেণি, শাখা: খ, রোল:৩২	সম্পর্ক: মামা